দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

রোহিঙ্গা নিয়ে
নেতিবাচক রাজনীতি
দেশের স্বার্থের পরিপন্থী
পৃঃ ১৬

বাংলাদেশে বন্যাত্রাণেও
বৈষম্য : বানভাসি হিন্দুর
আর্তি— হামাক খাওন দ্যাও
পৃঃ ৩৫

৭০ বর্ষ, ৮ সংখ্যা।। ১৬ অক্টোবর ২০১৭।। ২৯ আশ্বিন - ১৪২৪।। যুগাব্দ ৫১১৯।। দীপাবলী বিশেষ সংখ্যা।। website : www.eswastika.com ।।

মা কামাখ্যাদেবী

কামাখ্যাদেবীর মন্দির

মন্দিরের গর্ভগৃহ

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

দীপাবলী বিশেষ সংখ্যা

৭০ বর্ষ ৮ সংখ্যা, ২৯ আশ্বিন, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

১৬ অক্টোবর - ২০১৭, যুগাব্দ - ৫১১৯,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ / ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

আমাদের সামাজিক জীবনে জাতীয় আবেগ প্রতিফলিত হওয়া উচিত : শ্রী মোহনরাও ভাগবত □ ৬

দার্জিলিঙে রাজ্য বিজেপি সভাপতিকে হত্যাই লক্ষ্য ছিল গুণ্ডাদের □ গূঢ়পুরুষ □ ১১

ভারত-জাপান মৈত্রী— এশিয়ার রাজনীতির সূর্যোদয় □ প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় □ ১২

রোহিঙ্গা সমস্যা ও তার সমাধান □ রবীন্দ্রনাথ দত্ত □ ১৪

রোহিঙ্গা নিয়ে নেতিবাচক রাজনীতি দেশের স্বার্থের পরিপন্থী □ কে এন মণ্ডল □ ১৬

মাতৃপীঠ কামাখ্যা □ চন্দ্রভানু ঘোষাল □ ১৯

কালীতত্ত্বের সুলুকসন্ধানে □ জয়ন্ত কুশারী □ ২০

‘মা তোর কত রঙ্গ দেখব বল’ □ তপোময় দাস □ ২২

ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে রোহিঙ্গা সমস্যা একটি দৃষ্টান্ত হতে পারে □ স্বপন দাশগুপ্ত □ ২৭

চোরাবাগান মিত্র পরিবারের ৩৬৭ বছরের প্রাচীন কালীপুজো □ সপ্তর্ষি ঘোষ □ ৩১

শক্তিসাধনা □ কৃষ্ণচন্দ্র দে □ ৩২

নিয়মিত বিভাগ

এইসময়, সমাবেশ সমাচার : ২৪-২৬ □ **চিঠিপত্র : ২৯-৩০** □ **অঙ্গনা : ৩৭**

স্বস্তিকার সকল লেখক-লেখিকা, পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীকে জানাই শুভ বিজয়া ও দীপাবলীর প্রীতি-শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

— **স্বস্তিকা পরিবার**

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

জন্মসার্ধশতবর্ষে ভগিনী নিবেদিতা

সারা দেশ জুড়ে ভগিনী নিবেদিতার জন্মসার্ধশতবর্ষ পালিত হচ্ছে। এই সূত্রেই তাঁর মতো এক বিদেশিনীর ভারতীয় হয়ে ওঠার এবং সেই সঙ্গে ভারতীয় মনীষীদের বিশেষত জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞান সাধনায় তাঁর অবদানের কথাই আগামী সংখ্যার আলোচ্য।

লিখেছেন— অধ্যাপক কল্যাণ চক্রবর্তী, অধ্যাপক নির্মল মাইতি।

।। দাম একই থাকছে : দশ টাকা।।

হকার বন্ধুদের কাছে অনুরোধ স্বস্তিকার জন্য নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন—

বিশাল বুক সেন্টার

৪, টটি লেন
কলকাতা-৭০০০১৬

ফোন ঃ
(০৩৩) ৪০৬৪৪১০৩
৪০৬৪৪০৯৭

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

সম্পাদকীয়

সিপিএমের বিক্ষোভ-মিছিল

সিপিএম আবার একবার সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে পথে নামিয়াছে। কলকাতা-সহ দেশের কয়েকটি স্থানে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছে। এই ইস্যুতে কমরেডরা লাল ঝান্ডা লইয়া মিছিল করিয়াছে। এইসব মিছিলে লাল পার্টির বর্ষীয়ান নেতারাও পা মিলাইয়াছেন। যে-কোনও ইস্যুতেই রাস্তায় নামিয়া স্লোগান দেওয়ায় কমরেডরা অভ্যস্ত। যখন এই রাজ্যে কমরেডরা ক্ষমতায় ছিল তখন তাহাদের মিছিলে সাধারণ মানুষকেও দেখা যাইত। সেই সময় তাহাদের উপর রাজ্যের সাধারণ মানুষের নৈতিক সমর্থনও ছিল। কিন্তু হায়, সেইদিন এখন ধূসর অতীত। তাহাদের মিছিলে এখন আর সাধারণ মানুষকে দেখা যায় না।

ঘটনা হইল ভারতীয় জনতা পার্টির জাতীয় সভাপতি অমিত শাহ কেরল সফর শুরু করিয়াছেন। দেশের বেশিরভাগ রাজ্যই এখন বিজেপি ও তাহার জোট সঙ্গীর শাসনাধীন। বিজেপির এই জয়যাত্রার অর্থাৎ নির্বাচনী রাজনীতির প্রধান কারিগর অমিত শাহ। তাই তাঁহার কেরল সফরে সিপিএম অশনি সংকেত লক্ষ্য করিতেছে। শাহ-র এই সফরকে সাম্প্রদায়িক হিসাবে চিহ্নিত করিতে কমরেডরা রাস্তায় নামিয়া পড়িয়াছে। একটি রাজনৈতিক ইস্যুকে সাম্প্রদায়িক ইস্যুতে পরিবর্তন করিয়াছে। কেরলে প্রায় তিন দশক ধরিয়া মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সহিত বিজেপি এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সংঘর্ষ চলিতেছে। এই সংঘর্ষে সিপিএমের পক্ষে প্রধান মদতদাতা কেরলের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। বিজেপি এখন দক্ষিণ ভারতে নিজেদের জমি শক্ত করিতে সচেষ্ট হইয়াছে।

অন্যদিকে কমিউনিস্ট পার্টি কেরলে বিজেপিকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়িতে রাজি নয়। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ক্রমশ দ্বিতীয় রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। সম্প্রতি রাজ্যের পাঁচটি পুরসভা নির্বাচনেও তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ একসময় সিপিএমের দুর্গ ছিল। সিপিএম কোনও ভাবেই কাহাকেও সেই দুর্গে পা রাখিতে দিতে রাজি নয়। বিশেষত বিজেপিকে। আর এই কারণেই বিজেপির বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতা এবং মেরুকরণের রাজনীতির অভিযোগ। এই অভিযোগ লইয়াই রাস্তায় নামিয়া সিপিএম তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিতে চাহিতেছে। সিপিএমের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র বলিয়াছেন বামপন্থী সমর্থকদের উপর বিজেপি ও আর এস এস-এর হামলা বাড়িতেছে। দলের কেন্দ্রীয় সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরিরও অভিযোগ—কেরলে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত বামপন্থী সরকারের পতন ঘটাইবার জন্য বিজেপি অস্থিরতা সৃষ্টি করিতেছে। সিপিএমের ছোট-বড় নেতাদের এই অভিযোগ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন উঠিবে, পশ্চিমবঙ্গে তাহারা কেন সাফ হইয়া গেল? তখন তো এই রাজ্যে বিজেপির উত্থান হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে নিজেদের কৃতকর্মের জন্যই সিপিএম আজ অপ্রাসঙ্গিক হইয়া গিয়াছে। তাহাদের হার্মাদ বাহিনীর নৃশংসতা, রাজ্যের সাধারণ মানুষের উপর দলীয় কর্মীদের নির্যাতন ও ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন ও দখল, সমাজের সর্বস্তরে দলীয় স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এই রাজ্যে সিপিএমকে অপ্রাসঙ্গিক করিয়া দিয়াছে। বস্তুত প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই কমিউনিস্টদের ইতিহাস বর্বরতার ইতিহাস, বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস। তাই বিজেপি-র বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতা ও অস্থিরতা সৃষ্টির অভিযোগে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়া নিজেদের হৃত রাজনৈতিক জমি ফিরিয়া পাইবার আশা দুরাশা মাত্র। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কমরেডদের সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, পুনরুদ্ধার করিতে আর কত সময় লাগিবে তাহা তাহারা নিজেরাও জানে না।

সুভাষিতম্

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।

স্বাধ্যায়াভ্যসনঞ্চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্চতে।। (গীতা ১৭/১৫)

অনুদ্বেগকর, প্রিয়, হিতকারক ও যথার্থ বাক্যপ্রয়োগ এবং সদ্‌গ্রন্থের পাঠ ও ঈশ্বরের নাম-জপাদির অভ্যাসকে বাচিক তপস্যা বলা হয়।

নাগপুরে বিজয়া দশমী উৎসবে ভাষণ

আমাদের সামাজিক জীবনে জাতীয় আবেগ প্রতিফলিত হওয়া উচিত : শ্রীমোহনরাও ভাগবত

আমরা এখানে সমবেত হয়েছি এই বছরের গরিমামণ্ডিত বিজয়া দশমী উৎসব পালনের জন্য। এই বছর পরমপূজ্য পদ্মভূষণ কুশক বাকুলা রিনপোছের জন্মশতবর্ষ। এই বছর একই সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক শিকাগো বক্তৃতার ১২৫ বছর এবং তাঁর স্বনামধন্য শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতার জন্মের ১৫০ বছরও।

পুরো হিমালয় এলাকার বৌদ্ধরা কুশক বাকুলা রেনপোছেকে বকুল অর্হতের অবতার হিসেবে মনে করে। যে বকুল অর্হৎ ছিলেন তথাগত বুদ্ধের ১৬ জন শিষ্যের মধ্যে অন্যতম। বর্তমানকালে লাদাখে তিনিই সর্বাপেক্ষা পূজিত লামা। লাদাখ অঞ্চলে শিক্ষার প্রসারে, সামাজিক সংস্কারে, সামাজিক কুরীতি দূরীকরণে এবং জাতীয় চেতনার জাগরণে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৪৭ সালে যখন পাক সেনাবাহিনী কাবাইলি জনজাতির ছদ্মবেশে জম্মু ও কাশ্মীর আক্রমণ করে তখন তাঁরই অনুপ্রেরণায় লাদাখের যুবকেরা নুব্রা ব্রিগেড তৈরি করে প্রতিরোধ তৈরি করে এবং আগ্রাসনকারীদের স্কার্দু পেরোতে বাধা দেয়। জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভার একজন সদস্য হিসেবে, রাজ্য সরকারের একজন মন্ত্রীরূপে এবং লোকসভার এক সদস্য হিসাবে তাঁর অবদান সবসময়ই জাতীয় লক্ষ্যের অনুসারী থেকেছে। তিনি দীর্ঘ দশ বছর মঙ্গোলিয়ায় ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসাবে কাজ করেছিলেন। মঙ্গোলিয়ায় থাকার সময় সেখানে দীর্ঘ ৮০ বছরের কমিউনিস্ট শাসনের অবসানে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারে তিনি যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তা অনবদ্য। এই কারণে তিনি আজও মঙ্গোলিয়াবাসীর কাছে পরম শ্রদ্ধার পাত্র। ২০০১ সালে তাঁকে মঙ্গোলীয় নাগরিক সম্মান 'পোলার স্টার'-এর সম্মানিত করা হয়। তাঁর আধ্যাত্মিক সম্পদ, আপোশহীন জাতীয় দায়বদ্ধতা ও জনস্বার্থে নিরলস নিঃস্বার্থ কাজ তাঁকে আমাদের কাছে প্রণম্য ও উদাহরণযোগ্য করে রেখেছে। আচার্য বকুল তাঁর ব্যক্তিগত ও সামাজিক সংযোগের মাধ্যমে বৈশ্বিক মানবতার দিকে লক্ষ্য রেখে ভারতের জাতীয় দর্শন তুলে ধরেছিলেন, যা স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর শিকাগো বক্তৃতায় ব্যক্ত করেছিলেন।

এই জাতীয় দর্শনই আমাদের ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণের উদ্দেশ্যেই আদি কবি বাল্মীকি তাঁর মহাকাব্যে রামায়ণের বিষয়বস্তু হিসাবে মর্যাদা পুরুষোত্তম রামচন্দ্রকেই উপস্থাপিত করেছিলেন। ভক্তি আন্দোলনের আরেক অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় মানুষ রবিদাস মহারাজ আজকের সম্মানীয় অতিথির জন্য এক আদর্শ পুরুষ, যিনি তাঁর কর্ম ও বাণীর মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে একই আদর্শের বিস্তার ঘটিয়েছেন। ভগিনী নিবেদিতাও একইভাবে জাতীয় আদর্শের ওপর ভিত্তি করে সামাজিক জাগরণ ও হিন্দু সমাজের জাগরণে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ভারতের লক্ষ লক্ষ শিশুকে অজ্ঞতা ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দেবার জন্য তিনি তাদের মধ্যে স্বধর্ম ও স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধা জাগাতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন দেশবাসীকে।

জাতীয় সত্তা ও উদ্যোগের দিকে লক্ষ্য রেখে সমাজকে জাগ্রত করতে আমাদের বুদ্ধিজীবী ও চিন্তকদের ঔপনিবেশিক ভাবনা ও মনস্তত্ত্ব থেকে বেরিয়ে আসা অবশ্যই প্রয়োজন। ঔপনিবেশিক আমল থেকে চলে আসা এই কুপ্রভাব আমাদের মনকে গ্রাস করেছে এবং আমাদের আত্ম-অবমাননা, সংশয় ও সন্দেহ-প্রবণতার কারণ হয়েছে। ভগিনী নিবেদিতার জন্ম ও বেড়ে ওঠা ইউরোপীয় সংস্কৃতির মধ্যে হলেও ভারতীয় জনগণের মননকে সংহত করে শাশ্বত মূল্যবোধ ও সংস্কারের বিকাশ ঘটাতে তিনি সার্থক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের চিরন্তন জাতীয় দর্শন ও মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে, আমরা সবাই এক— এই ভাবনা তাঁকে প্রাণিত করেছিল।

রাষ্ট্র কৃত্রিমভাবে গড়ে ওঠে না। আমাদের রাষ্ট্রের অস্তিত্ব জনগণ ও সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। যা সম্পূর্ণ ভাবে স্বতন্ত্র এবং ক্ষমতাভিত্তিক জাতি-রাষ্ট্রের (nation-state) ধারণা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। আমাদের ভাষা, অঞ্চল, গোষ্ঠী, উপাসনা পদ্ধতি, আচার- আচরণ ইত্যাদি ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও আমাদের সংস্কৃতিই আমাদের এক সূত্রে বেঁধে রেখেছে। এই সংস্কৃতির উৎস হলো আমাদের জীবনের শাশ্বত মূল্যবোধ যা বিশ্বপরিবার রূপে মানবতাকে প্রতিষ্ঠা দেয়— এটাই আমাদের সামগ্রিক বন্ধনের মূলমন্ত্র। জাতীয়তার জীবন-দর্শন আমাদের অনুভবলব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছে, যা আমরা স্মরণাতীতকাল হতে এই ভূমি থেকে আহরণ করতে পেরেছি। ওই অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা সামগ্রিক প্রচেষ্টা ও সত্যের প্রতি সামগ্রিক বোঝাপড়া ও উপলব্ধি গ্রহণ করতে পেরেছি। এই একই মনোবৃত্তি আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনেও প্রতিফলিত হয়। এভাবেই প্রকৃত অর্থে এক 'রাষ্ট্র' বিবর্তিত হয় এবং তা সারা বিশ্বের স্বীকৃতি পায়। এই জাতিই (নেশন) বিশ্ব-জীবনে তার প্রত্যাশিত ভূমিকা দ্বারা কোনো অর্থবহ অবদান রেখে যেতে পারে।

ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে, বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা আংশিকভাবে এই সত্য উপলব্ধি করেছি। আমাদের উদ্যোগে যোগ-বিজ্ঞান স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে বিশ্বের কাছে, যা আমাদের কাছে গভীর সন্তুষ্টি ও প্রাচীন ঐতিহ্যের বিষয়ে

নাগপুরে বিজয়াদশমী উৎসবে ভাষণরত সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত।

গর্বের কারণ হয়েছে। দেশের পশ্চিম প্রান্তে পাকিস্তানের সক্রিয়তা ও উত্তর প্রান্তে চীনের কাজকর্মের প্রতিক্রিয়ায় ভারতের শক্ত ও দৃঢ় পদক্ষেপ, যা ডোকলামের ঘটনায় ভালোভাবে বোঝা গিয়েছে আন্তর্জাতিক কূটনীতি ও সীমান্ত রক্ষায় আমাদের তৎপরতা। এটা অবশ্যই আমাদের শক্তির পরিচায়ক ও একই সঙ্গে ভারতকে নয়া আন্তর্জাতিক অবস্থানেও এনে দিল। একের পর এক মহাকাশ বিজ্ঞানে সাফল্য আমাদের মেধাশক্তির প্রমাণ। আমাদের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা ব্যবস্থাও ক্রমে উন্নতি করছে। পরিকাঠামো, বিশেষ করে যান-যোগাযোগ দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে, এমনকী সীমান্ত এলাকা যেমন অরুণাচল প্রদেশেও। মহিলাদের সম্মান ও উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প যেমন 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' ইত্যাদি চালু হয়েছে। 'স্বচ্ছ ভারত' অভিযানের উদ্যোগ নিয়ে নাগরিকদের মধ্যে তাঁদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করা হয়েছে, তাঁদের যোগদানও নিশ্চিত করা হয়েছে। বহু ছোটো-বড়ো সংস্কারের প্রয়াস করে ও আমাদের চিন্তন-প্রক্রিয়ার মৌলিক বদল ঘটিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে নতুন আশার বীজ বপন করা হয়েছে। একই সঙ্গে প্রত্যাশার পারদও তাই অনেকটা চড়েছে। বহু বিষয়ের ওপর সমাজে এখন আলোচনা চলছে, যে যে বিষয়গুলি সংঘটিত হচ্ছে সেগুলি আরও কীভাবে উন্নত করা যায় ও সেগুলি কীভাবে সংঘটিত হওয়া উচিত তা নিয়ে।

যেমন জঙ্গি অনুপ্রবেশ ও যুদ্ধ বিরতি লঙ্ঘন নিয়ে সরকার যে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছে সমাজ তার প্রশংসা করেছে। সমস্ত নিরাপত্তা বাহিনী, সেনাবাহিনী সমেত, তাদের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কাজকর্ম ও প্রচারকে নিয়ন্ত্রণ করা গিয়েছে তাদের অবৈধ আর্থিক উৎসে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে ও তাদের সঙ্গে দেশ-বিরোধী জঙ্গি যোগের বিষয়টি ফাঁস করে। বাস্তবে এই পরিকল্পনার ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন প্রশাসনের মাধ্যমে কোনো ভেদাভেদ না রেখে জম্মু-কাশ্মীরে জম্মু ও লাদাখ এলাকা-সহ, সেখানকার সাধারণ মানুষের মধ্যে উন্নয়নের সুবিধা পৌঁছে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। ওই রাজ্যে উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান এখনও হয়নি। দশকের পর দশক কয়েকটি প্রজন্ম এই রাজ্যে দুর্দশাগ্রস্ত উদ্বাস্তুর জীবন কাটাতে বাধ্য হয়েছেন, কারণ তাঁরা ভারতের থাকার ও হিন্দু হিসেবে জীবনধারণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বলে। ভারতবর্ষের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও গণতান্ত্রিক অধিকারের মৌলিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত এবং তাঁরা অনগ্রসর জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন। এটা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র জম্মু-কাশ্মীরে বিভেদমূলক সুবিধাগুলি জারি থাকায় যা মৌলিক অধিকারকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। ১৯৪৭ সালে পাক-অধিকৃত জম্মু-কাশ্মীর থেকে যে স্থায়ী বাসিন্দারা অভিবাসী হয়েছিলেন এবং ১৯৯০ সালে কাশ্মীর উপত্যকা থেকে যাঁরা উদ্বাস্তু হয়েছিলেন, এই দুই সমস্যাই আজও অপরিবর্তিত রয়েছে। সুতরাং আমাদের সেই পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে যাতে আমাদের ভাইয়েরা সুখী, মর্যাদাসম্পন্ন ও নিরাপদ জীবন কাটাতে পারেন, অন্যান্য ভারতীয়দের মতো। এর জন্য তাঁদের সমান গণতান্ত্রিক অধিকার ও তাঁদের প্রতি গণতান্ত্রিক কর্তব্যের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে, তাঁদের ধর্ম ও জাতীয় পরিচয়কে দৃঢ়ভাবে ও নিষ্ঠার সঙ্গে বজায় রেখেই। ঠিক এই কাজটির জন্য প্রয়োজন সংবিধান সংশোধন ও পুরোনো ধারাগুলির পরিবর্তন। তখন, কেবলমাত্র তখনই বাকি

ভারতের সঙ্গে জম্মু-কাশ্মীরের অধিবাসীরা একাত্ম হতে পারবেন এবং তাঁদের সমান সহযোগিতা ও জাতীয় উন্নয়নে যোগদান সম্ভবপর হবে।

রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য সমাজেরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সীমান্ত এলাকায় যে নাগরিকেরা বাস করেন, লাগাতার সীমা পেরিয়ে গোলাবর্ষণ ও জঙ্গি অনুপ্রবেশের মধ্যেও তাঁরা সাহসের সঙ্গে মাটি কামড়ে পড়ে রয়েছেন। এইভাবে তাঁরা সরাসরি দেশ-বিরোধী শক্তির সঙ্গে লড়াই করছেন। তাঁরা ক্রমাগত নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন ও তাঁদের জীবন-জীবিকা বিঘ্নিত হচ্ছে। সরকার ও প্রশাসনের ত্রাণের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনেরও উচিত এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা ও তাঁদের সাধ্যমতো সাহায্য করা। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছেন। এ নিয়ে ভাবনা ও কর্ম আরও বৃদ্ধি পেলে সরকার ও সমাজ যৌথ উদ্যোগে উন্নততর পরিষেবা প্রদান করতে পারে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবিকা ক্ষেত্রে আমাদের আরও উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন যাতে কাশ্মীর উপত্যকা ও লাদাখের প্রত্যন্ত সীমা প্রান্তেও জাতীয় মূল্যবোধের বিষয়গুলি অনুভূত হয়। এই লক্ষ্যপূরণের জন্য পরিস্থিতি অনিবার্যভাবেই সমাজের গঠনমূলক সংযোগ দাবি করছে এবং সেইসঙ্গে বিভিন্ন সতর্কতা, জাগরণমূলক কর্মসূচি ও জনমনের পুনর্গঠনের আবশ্যকতা রয়েছে। বছরের পর বছর ধরে পদ্ধতিগত মিথ্যা প্রচারের দ্বারা যে অশান্তি ও বিচ্ছিন্নতার বিষবাষ্প সৃষ্টি করা হয়েছে তা দূর করতে হলে সমাজকে তার অকৃত্রিম স্নেহ প্রদর্শন করতে হবে, সমস্ত ইতিবাচক কর্মের মাধ্যমে। এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব নিতে গেলে সমগ্র সমাজকে দেশবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে সুচিন্তিত ও দৃঢ় নীতি গ্রহণ করতে হবে।

এই ভাবনা এই মুহূর্তে আরও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ দেশবিরোধী শক্তি এখন এমন এক বিপজ্জনক খেলায় মেতেছে যেখানে অশান্তি, বিচ্ছিন্নতাবাদ, হিংসা, শত্রুতা ও ঘৃণা ছড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে ভাষা, আঞ্চলিকতা, জাতপাত, উপাসনা পদ্ধতি ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে। বিশেষ করে এই প্রক্রিয়াতেই সীমান্ত এলাকায় আমাদের সংবিধানকে অসম্মান করার পরিবেশ তৈরির একটা চেষ্টা চলছে। বাংলা ও কেরলের পরিস্থিতির কথা সবারই জানা। সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার ও তাদের প্রক্রিয়াগত রাজনৈতিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা কেবলমাত্র এই গুরুতর জাতীয় সংকটের প্রতি অসহানুভূতি সম্পন্নই নয়, সস্তা রাজনৈতিক স্বার্থে জাতীয়তা বিরোধী শক্তির সাহায্যকারীও। এই সমস্ত দেশবিরোধী কাজকর্মের খবরাখবর নিশ্চয়ই কেন্দ্রীয় সরকারের কানে পৌঁছেছে এবং তাদের অবশ্যই এই আঁতাত বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। কিন্তু সীমান্তে চোরাচালান, গোপাচার-সহ এক উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। আমাদের দেশ ইতিমধ্যেই অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীর সমস্যায় জর্জরিত এবং এখন মায়ানমার থেকে রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ শুরু হয়েছে। বহু রোহিঙ্গা ভারতে অবৈধ অনুপ্রবেশ করতে তৈরি। তাদের মায়ানমার থেকে বিতাড়ন করা হয়েছে সেদেশে তাদের ক্রমাগত হিংস্র ও অপরাধমূলক বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপের জন্য এবং সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে যোগাযোগ থাকার কারণে। এই রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে যে-কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে এটা অবশ্যই মাথায় রাখা দরকার যে তারা জাতীয় সুরক্ষা ও সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক। সরকারও এইভাবে বিষয়টি দেখতে পারে। এই জটিল পরিস্থিতিতে সাফল্য কখনোই সম্ভব নয়, সমগ্র সমাজের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া। এর জন্য, এই সমস্ত রাজ্যের 'সজ্জন শক্তি'কে নির্ভয়ে এগিয়ে আসতে হবে। তাদের সংগঠিত হতে হবে, সক্রিয় হতে হবে এবং সমাজকে আলোকপ্রাপ্ত, সতর্ক ও ভয়মুক্ত করতে হবে।

প্রণালী অনুসারে, সীমান্ত পাহারা দেওয়া ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সশস্ত্র বাহিনী, আধাসামরিক বাহিনী ও পুলিশের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। স্বাধীনতার পর থেকে এই কাজ তাঁরা পূর্ণ উদ্যম, নিষ্ঠা ও নিবেদিত ভাবে করে চলেছেন। তবুও সরকারি স্তরে এই প্রক্রিয়াকে আরও তরান্বিত করা উচিত এঁদের পর্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে, অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করে, গোয়েন্দা সংস্থাগুলির সঙ্গে সমন্বয় বাড়িয়ে, এঁদের ও এঁদের পরিবারবর্গের প্রতি যত্ন নিয়ে, সেনা-প্রস্তুতিতে জাতীয় আত্মবিশ্বাস নিশ্চিন্ত করে, প্রচুর মানবশক্তি নিযুক্ত করে এবং এই ধরনের বাহিনীর উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। এই সমস্ত বাহিনীর সঙ্গে সরকারের সরাসরি যোগাযোগ আরও উন্নত হওয়া প্রয়োজন। সমাজের কাছে আমাদের প্রত্যাশা ও এটা তাঁদের কর্তব্য যে সেনাবাহিনী ও তাঁদের পরিবারবর্গের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন। পাশাপাশি সঠিক নীতি গ্রহণ করে যেখানে জাতীয় স্বার্থ ও আশা-অকাঙ্ক্ষা জড়িত থাকবে এবং তা আমাদের প্রত্যাশা ও প্রয়োজনীয়তাকে পূরণ করতে পারবে; এর জন্য সংগঠিত হওয়া প্রয়োজন। জীবনের প্রতিটি পদে আমাদের জাতীয় গর্বগুলিকে উপলব্ধি করার জন্য এক পবিত্র সমাজের দরকার। এই ধরনের নীতিগুলি প্রশাসনের তরফে আত্মস্থ করা প্রয়োজন ও এর ফলপ্রসূ প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় মানসিকতা থাকাটাও জরুরি।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও একই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করতে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন আনতে হবে। শেষতম ব্যক্তিটির কাছেও উন্নয়ন কর্মসূচি পৌঁছে দিতে হবে। জনধন যোজনা, মুদ্রা, গ্যাস ভরতুকি, কৃষি বিমা ইত্যাদি জনকল্যাণকারী প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারের তরফে কিছু দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তবুও একটি সুসংহত ও সামগ্রিক নীতির প্রয়োজন যেখানে একটি জাতির ('নেশন' অর্থে) বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা ও বৈচিত্র্যের বিষয়গুলি বিবেচনার মধ্যে থাকবে। শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ও পরিবেশের বিষয় ভাবা দরকার, যেখানে বড়, মাঝারি, ছোটো প্রতিটি ব্যবসায়ীর স্বার্থ সুরক্ষিত থাকবে, ছোটো খুচরো ব্যবসায়ী থেকে কৃষক, ভূমিহীন খেতমজুর প্রত্যেকে এতে উপকৃত হবেন, এমনটা হওয়া প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক নীতি ও মানদণ্ড গ্রহণের ফলে একধরনের বাধ্যবাধকতা এসে গিয়েছে। যদি এগুলি ভ্রান্ত, কৃত্রিম, সমৃদ্ধির মিথ্যা চিত্র তৈরি করে তবেও। এগুলি আমাদের নৈতিকতা, পরিবেশ, কর্মসংস্থান ও আত্মবিশ্বাসকে নষ্ট করছে, বোঝা দরকার এগুলি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত করা যেতে পারে। যদিও এটা মহাবৈশ্বিক ভাবে স্বীকৃত যে এই ধরনের নীতি ও মানদণ্ড পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে জাতি-নির্দিষ্ট 'মডেল' বিবর্তিত হয়। আমাদের

'নীতি আয়োগ' ও রাজ্যগুলির অর্থনৈতিক উপদেষ্টাদের পুরানো অর্থনৈতিক 'মতবাদ' ('ইজম') থেকে বেরিয়ে এসে দেশের সাম্প্রতিকতম অর্থনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংহত হওয়া প্রয়োজন। এই পদ্ধতি প্রণালীগত ভাবে বিবেচনার মধ্যে আনবে জাতীয় আদর্শ, ঐতিহ্য, প্রয়োজনীয়তা ও সম্পদকে। দেশবাসীকে তাঁদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তা মেটাতে ও অন্যান্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বদেশী পণ্য কেনার জন্য অবিশ্রান্ত ভাবে উৎসাহিত করতে হবে।

সাধারণ মানুষের উন্নয়নের জন্যই সরকারের প্রকল্প ও নীতিগুলি তৈরি হয়। এগুলি মানুষকে উদ্যোগপতি ও সক্রিয় হতেও সাহায্য করে। অর্থনৈতিক প্রকল্পগুলির প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে, সমস্ত সূত্র থেকে বাস্তবোচিত তথ্য সংগ্রহ করে একটি 'সিস্টেম' তৈরি করতে হবে যাতে প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই প্রকল্পগুলির সুফল চুঁইয়ে নিম্নতম স্তরেও পৌঁছে যায়। সরকারের আন্তরিকতায় স্থায়ী আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, সংহতি, গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত মানুষের চরিত্র ও তাদের পরিশ্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম প্রকৃতির জন্ম হয়। যদি 'নেশন' হিসেবে এগুলি প্রাপ্তির সৌভাগ্য ঘটে, বহু বছর অপেক্ষার পর, তাহলে উপরোল্লিখিত বিন্দুগুলি বিবেচনার মধ্যে আসবে।

ত্রুটিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও জিডিপি (গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট) এখন পর্যন্ত স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাপকাঠি হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। কর্মসংস্থান যে জীবনের প্রতিটি পর্বে সক্রিয় এবং ভালোভাবে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয়, এটাই আমাদের প্রধান বিবেচনায় আসে। এই মানদণ্ডে ছোটো, মাঝারি ও হস্তশিল্প, খুচরো বা ছোটো স্বনির্ভর ব্যবসা, সমবায় ক্ষেত্র এবং কৃষি ও কৃষি-সংক্রান্ত ক্ষেত্রে বৃহত্তম বিনিয়োগ হয়। বিশ্ব বাণিজ্যের ওঠা-পড়ায় ও অর্থনৈতিক ভূকম্পনে এরা আমাদের সামনে সুরক্ষা বলয় তৈরি করে। আমাদের পারিবারিক পদ্ধতির শিকড় এখনও গভীরে থাকায় পরিবারের মহিলারা ঘরে বসেই ক্ষুদ্র ব্যবসার মাধ্যমে পারিবারিক আয়ে অংশগ্রহণ করেন। অনেক সময় একে অপ্রথাসিদ্ধ অর্থনীতি বলেও অভিহিত করা হয়। দুর্নীতির প্রমাণ এক্ষেত্রে যথেষ্ট কম। কোটি কোটি মানুষ এই সেক্টরে কাজ পাচ্ছেন বা তাঁদের কর্মসংস্থান হচ্ছে। সমাজের শেষ সারিতে থাকা মানুষজনের অধিকাংশই এই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবস্থান করেন। যখন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংস্কার ও পরিচ্ছন্নতা আসবে, যদিও সেই সঙ্গে কিছু অর্থনৈতিক কম্পন ও অস্থায়িত্বও প্রত্যাশিত, তবে এটা মনে রাখা দরকার যে এই ক্ষেত্রটিতেই এর সবচেয়ে কম আঁচ পড়বে এবং শেষ পর্যন্ত এরাই সর্বোচ্চ শক্তি লাভ করবে। যেহেতু মূল্যবোধ আমাদের ঐতিহ্যগুলিকে মহিমামণ্ডিত করে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ও বড়ো শিল্পপ্রতিষ্ঠানে, এমনকী কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্বের ধারণা তৈরির পূর্বেও তা বিরাজ করতো। এই মূল্যবোধ আপ্রাণ চেষ্টা করে ওই ধরনের মানুষগুলির জীবনযাপন পদ্ধতি উন্নত করার ব্যাপারে, তাদের উৎপাদনের গুণমান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দক্ষতা ও বাজারে তা চলার জন্য সুবিধা প্রদান করে। সমকালীন এই সমস্ত প্রয়াস একটি বিশেষ দিকের প্রতি ধাবিত হয়। যাই হোক, গৃহস্তরে 'অন্ত্যোদয়'-এর মতো একটি মডেল দাঁড় করানো আমাদের স্বপ্ন এবং এর মতো ভারসাম্যযুক্ত, প্রভাবী ও গতিশীল অর্থনীতি বিশ্বস্তরে কখনোই সম্ভব নয় যতক্ষণ না আমাদের অর্থনৈতিক চিন্তন বিকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক উৎপাদনের ওপর ভিত্তি করে হবে, ভোগবাদের রাশ টেনে ধরবে, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করবে, শক্তি সংরক্ষণ করবে, পরিবেশ রক্ষা করবে এবং ব্যক্তিকে সঠিক পথে নিয়ে যাবে। বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি থেকে যদি আমাদের এগিয়ে যেতে হয় তবে এই মৌলিক বিষয়গুলিকে স্মরণে রাখতে হবে। কেন্দ্র ও রাজ্য স্তরে তথাকথিত অবহেলিত সমাজের জন্য নানান সুবিধার বন্দোবস্ত রয়েছে, যেমন তপশিলি জাতি-উপজাতি, যাযাবর উপজাতি ইত্যাদি। এই সুযোগগুলি এঁদের প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে দেওয়া উচিত। সরকার ও প্রশাসনকে এ ব্যাপারে সতর্ক ও স্পর্শকাতর হতে হবে। অন্যদিকে সমাজেরও এনিয়ে আন্তরিক সহযোগিতার প্রয়োজন।

আমাদের দেশে শিল্প (ইন্ডাস্ট্রি), ব্যবসা ও কৃষিক্ষেত্রকে প্রতিযোগিতামূলক নয়, সম্মান-সূচক অর্থনৈতিক ক্ষেত্র হিসাবে দেখা হয়। কৃষিই হলো ভারতের বৃহত্তম অর্থনৈতিক ক্ষেত্র। আমাদের কৃষকেরা প্রকৃতিগতভাবে শুধু নিজ পরিবারের মুখেই অন্ন জোগান না, দেশবাসীর মুখেও অন্ন তুলে দেন। তাঁরা আজ কষ্টে রয়েছেন। বন্যা ও খরার পর্যায়ক্রমিক প্রকোপ তাঁদের দুঃখের কারণ হয়েছে। আমদানি-রপ্তানি নীতি, অল্প দাম, ঋণে জড়িয়ে যাওয়া এবং একবার ফসল ধ্বংস হলে তাঁরা সর্বস্বান্ত হন। নতুন প্রজন্মের মধ্যে এই মানসিকতা ক্রমশ দেখা দিচ্ছে যে হয় তারা রোজগারের জন্য শহুরে শিক্ষিত হয়ে বেকার থাকছে, নয়তো খেতে-খামারে কাজ করার জন্য শিক্ষা বন্ধ রেখে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে গ্রামে থাকতে বাধ্য হয়েছে। এর ফলে গ্রাম ক্রমশ ফাঁকা হচ্ছে, এবং বড়ো শহরের বোঝা অনেক বাড়ছে। ফলে গ্রাম ও শহর উভয় ক্ষেত্রেই উন্নয়নের সংকট দেখা দিচ্ছে। শহরে অপরাধের ঘটনার সংখ্যা বাড়ছে। প্রশংসনীয় কিছু প্রকল্প যেমন শস্যবিমার সূচনা হয়েছে, মাটি পরীক্ষা এবং কৃষিপণ্যের বিপণন এই ক্ষেত্রে কার্যকরী পদক্ষেপ। তবুও কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির আরও সতর্ক নজর দেওয়া প্রয়োজন যাতে বাস্তবে এই ধরনের প্রকল্পের প্রয়োগ যথোচিত হয়। কিছু বিষয় যেমন ঋণখেলাপিদের বিষয়টি সরকারের সহানুভূতি ও সদিচ্ছার সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত। কিন্তু এগুলি সাময়িক, সমস্যার স্থায়ী সমাধান কখনোই নয়। নতুন কারিগরীবিদ্যা ও চিরন্তন দূষণহীন কৃষিকর্ম পদ্ধতিকে জোটবদ্ধ করতে হবে কৃষকদের জন্য, যাতে তাঁরা ন্যূনতম বিনিয়োগে কৃষিকর্ম শুরু করতে পারেন ও ঋণের ফাঁদে যাতে তাঁদের না পড়তে হয়।

নতুন কারিগরী কৃষি পদ্ধতি কেবলমাত্র তখনই গ্রহণ করা যেতে পারে যখন এটা নিশ্চিত হবে যে এর কুপ্রভাব মাটির স্বাস্থ্যের ওপর দীর্ঘস্থায়ী হবে না, পরিবেশ ও মানবসভ্যতারও কোনো ক্ষতি করবে না। কৃষকদের অবশ্যই বিনিয়োগের ওপর লাভের সঙ্গে ন্যূনতম মূল্যও পাওয়া উচিত যাতে তাঁরা তাঁদের পরিবার প্রতিপালন করতে পারেন ও পরের বছর কৃষিকর্মের জন্যও যাতে তাঁদের হাতে টাকা থাকে। সহায়ক মূল্যের ওপর ভিত্তি করে শস্য কেনার বিষয়টি সরকারকেই নিশ্চিত

করতে হবে। জৈব চাষ, মিশ্র চাষ ও গোভিত্তিক চাষের প্রচলন করতে হবে। রাসায়নিক চাষ যা আমাদের খাদ্যকে বিষিয়ে দেয়, জল ও মাটিকে দূষিত করে এবং কৃষকের খরচ বাড়িয়ে দেয় তাকে ধীরে হলেও ত্যাগ করা উচিত।

যখন আমরা ন্যূনতম পুঁজি নিয়ে, জৈব পদ্ধতিতে কৃষিকর্মের কথা বলছি তখন এই বিষয়টিও উঠবে যে আমাদের দেশের অধিকাংশ কৃষকই ক্ষুদ্র ভূমির মালিক, যেখানে সেচের বন্দোবস্ত প্রায় নেই। এই ধরনের কৃষকদের ক্ষেত্রে গোভিত্তিক কৃষিই সহজতম উপায় যা বিষমুক্ত ও ন্যূনতম পুঁজিযুক্ত কৃষি-পদ্ধতি। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক, সমস্ত ক্ষেত্রের সাধু-সন্ত, অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে গোরক্ষা ও সংবর্ধনের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। আমাদের সংস্কৃতিতে গো-জাতি হলো শ্রদ্ধার প্রতীক। আমাদের সংবিধানের নির্দেশিত নীতিই হলো গোরক্ষা এবং বহু রাজ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শাসনকালে এই বিষয়ে আইন তৈরি হয়েছে। ভারতীয় গো-প্রজাতির উপকারিতা এখন বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত। যেমন দেশি গাইয়ের দুধের পুষ্টিমূল্য এ-২, গোবরের ঔষধ-মূল্য ও মানব-সমাজের জন্য গো-মূত্রের উপকারিতা, এদের কৃষি-মূল্য যা সার ও কীটনাশকের গুণমান বাড়িয়ে মাটির স্বাস্থ্যরক্ষা করে এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থেকে আমাদের বাঁচায়। এই বিষয়ে এখন বহু গবেষণা হচ্ছে। প্রতিটি রাজ্যে বিশেষ করে বাংলাদেশ সীমান্তে গো-পাচার একটি গুরুতর সমস্যার আকার ধারণ করেছে। এই পরিস্থিতিতে গোরক্ষা ও গো-সংবর্ধনের কর্মসূচি আরও বেশি জরুরি। যাঁরা এ বিষয়ে সক্রিয় তাঁরা তাঁদের কর্মসূচি আইনি ও সংবিধানের সীমার মধ্যে রেখেই করেছেন।

সম্প্রতি এ-সংক্রান্ত কিছু হিংসা ও অত্যাচারের ঘটনার অনুসন্ধানের পর এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে এই গোরক্ষকেরা বা গোরক্ষা কর্মসূচির সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁরা কোনো ধরনের হিংসায় জড়িত নন। অন্যদিকে এও দেখা গিয়েছে যে বহু গোরক্ষক, যাঁরা শান্তিপূর্ণ ভাবে গোরক্ষায় নিয়োজিত ছিলেন তাঁদের ওপর হামলা হয়েছে ও হত্যা করা হয়েছে। এই ধরনের ঘটনা কোথাও আলোচিত হয়নি বা এর তদন্তও হয়নি। এটা অত্যন্ত অশোভনীয় যে গোরক্ষকদের বা গোরক্ষা কর্মসূচিতে যাঁরা যুক্ত, তাঁদের সঙ্গে হিংসার ঘটনা বা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে— পুরো ঘটনা না জেনে কিংবা সত্য গোপন করে। এই কাজটি ক্রমাগত করা হচ্ছে। ইসলাম উপাসনা পদ্ধতির বহু মানুষও গোরক্ষা, গো-সংবর্ধন ও গোশালা পরিচালনার কর্মসূচিতে যুক্ত। তাঁদের অনেকে আমাকে বলেছেন গোরক্ষার বিরুদ্ধে এই ধরনের জঘন্য প্রচারের লক্ষ্য একটাই যে ভিন্ন উপাসনা পদ্ধতির মানুষের মধ্যে অকারণ ভীতি সঞ্চার করা।

এই পরিস্থিতিতে গো-সংরক্ষক ও গো-সংবর্ধকদের, যাঁরা পবিত্রতার সঙ্গে এই কর্মে নিয়োজিত, তাঁদের উদ্বিগ্ন কিংবা হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই, সরকারের উচ্চপদস্থ ব্যক্তির উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিবৃতি কিংবা সুপ্রিম কোর্ট তাদের যে মতামতই রাখুন না কেন। যে ব্যক্তিরা অপরাধমূলক ও হিংসামূলক ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তাদের সম্পর্কে চিন্তা করার কারণ রয়েছে। কায়েমি স্বার্থ ও এই ধরনের বিবৃতির অপব্যাখ্যা বৃহত্তর জনমতে প্রভাব বিস্তার করে। সরকার ও প্রশাসনের উচিত এই ধরনের অপব্যাখ্যা থেকে দূরে থাকা এবং দুষ্কৃতীরা যাতে উপযুক্ত শাস্তি পায় তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন এবং নির্দোষরা যাতে কষ্টা না পায়, তাও দেখা উচিত। গোরক্ষা ও গো-সংবর্ধনের আইনি ও সৎ উপায় মানুষের আগ্রহের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে এবং আগামী দিনে এই আগ্রহ আরও বাড়বে। এটাই আগামী দিনে বর্তমান পরিস্থিতির উপযুক্ত জবাব হবে।

সফল কৃষি-ব্যবস্থার জন্য সেচ-ব্যবস্থা হলো আরেকটি পূর্ব- নির্ধারিত শর্ত। আমরা তুলনামূলকভাবে ভাবতে পারি যে প্রতি বছর বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জলের উৎসগুলি থেকে সবটুকু জল যাতে সংগ্রহ করা যায়। বিষমুক্ত কৃষি ও জলসেচের ক্ষেত্রে সরকার ইতিমধ্যেই জলসম্পদ সঞ্চয়, সংরক্ষণ, নদী পরিষ্কার, নদীতে জলের প্রবাহ অপ্রতিহত রাখা, সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলি পুনরুজ্জীবিত করা, বৃক্ষ রোপণ ইত্যাদি ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছে। সামাজিক স্তরেও জল- ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অনেক মানুষ বেসরকারি ও ফলপ্রসূ কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। নদীর জন্য পদযাত্রা (র‍্যালি ফর রিভারস) ইত্যাদি প্রকল্পের মাধ্যমে জলের সঙ্গে জঙ্গল জোড়ার কাজ চলছে। কয়েকটি স্থানে বনাঞ্চলের গ্রামের স্বীকৃত বাসিন্দারা জঙ্গল সংবর্ধন ও সংরক্ষণের জন্য প্রশংসাযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এটা ইতিবাচক লক্ষণ। এটা আশা করা যেতেই পারে যে সামগ্রিকভাবে এই পদক্ষেপগুলি কৃষি ও পরিবেশ ক্ষেত্রে নতুন সমৃদ্ধ 'মডেল'-এর জন্ম দেবে।

জাতীয় পুনরভ্যুদয়, সমাজের সামগ্রিক প্রয়াস অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ও প্রশাসনিক পদক্ষেপের চেয়ে। এই প্রেক্ষিতে, শিক্ষা প্রণালী খুব গুরুত্বপূর্ণ। ঔপনিবেশিক শাসনকালে বিদেশি শাসকেরা শিক্ষা-ব্যবস্থা, শিক্ষা-বিধি ও শিক্ষা-পরিচালনায় বহু ধ্বংসাত্মক পরিবর্তন এনেছিল। এর পেছনে বিদেশি শাসকদের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় সামাজিক মননে হীনমন্যতার জন্ম দেওয়া। এর প্রভাব থেকে আমাদের মুক্ত করতে পারে প্রকৃত শিক্ষা। নতুন শিক্ষানীতির পরিকল্পনা এমনটাই হওয়া দরকার যাতে বনাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের প্রত্যন্ত প্রান্তে অবস্থিত শিশু ও যুবকদের কাছেও শিক্ষা সাধ্যের নাগালে ও গ্রহণীয়তার মধ্যে আসতে পারে। শিক্ষা-বিধি অবশ্যই সবরকম 'ইজম' মুক্ত হবে এবং তা সত্যানুসন্ধানের ওপর ভিত্তি করে, আমাদের জাতীয়তা ও জাতীয় গৌরবের প্রতি লক্ষ্য রেখে হবে। শিক্ষা আমাদের মনে স্বনির্ভরতার বীজ বপন করবে, সেরা গুণমানের ইচ্ছা প্রতিফলিত করবে; জ্ঞান, পাঠ-প্রিয়তা ও প্রতিটি ছাত্রের কঠোর পরিশ্রম, সেইসঙ্গে চরিত্রের মূল্যবোধ, নম্রতা, বিচক্ষণতা ও দায়িত্ববোধ—প্রকৃত শিক্ষা আমাদের মনে এই সংস্কারগুলি গেঁথে দেয়। শিক্ষকেরা ছাত্রদের সঙ্গে এক সূত্রে বাঁধা থাকবেন এবং নিজ জীবনের উদাহরণ দিয়ে তাঁদের শিক্ষা দেবেন। এমনকী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির পরিবেশও এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। সঠিক প্রকারের পরিকাঠামো, যাবতীয় শিক্ষা-সরঞ্জাম, পরীক্ষাগার ও গ্রন্থাগার-সহ নির্মাণ করতে হবে। শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধ করে সরকারি স্কুল ও কলেজগুলিতে ন্যূনতম গুণমান সুনিশ্চিত করে এগুলি পরিচালনা করা উচিত। দেশে বহু গবেষণা

(শেষাংশ ৩৬ পাতায়)

দার্জিলিঙে রাজ্য বিজেপি সভাপতিকে হত্যাই লক্ষ্য ছিল গুণ্ডাদের

গূঢ় পুরুষের

কলম

রাজ্যজুড়ে হিংসার রাজনীতি ছড়াচ্ছে শাসক তৃণমূল দল। এর পরিণাম শুভ নয়। বিজ্ঞানের সূত্র বলছে, প্রতিটি ক্রিয়ার সমান প্রতিক্রিয়া হয়। গত ৫ অক্টোবর দার্জিলিং শহরের রাস্তায় ফেলে পেটান হয় বিজেপি নেতাদের। হেনস্থা করা হয় বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ এবং প্রথম সারির নেতা জয়প্রকাশ মজুমদারকে। সূত্রের খবর, নবান্ন থেকে নির্দেশ যায় বিনয় তামাং এবং অনীত থাপার কাছে এমনভাবে মারতে হবে যে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও বাংলা সফরের আগে ঘাবড়ে যাবে। ভয় পাবে। একটা সময় ছিল যখন সিপিএম গণতন্ত্রের নামে হিংসার রাজনীতি অবাধে চালিয়েছে। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তখন ছিলেন প্রধান টার্গেট। মমতা তাঁর লেখা 'সিঙ্গুর জয়ী' বইতে ক্ষমতাগর্বী বাম শাসকদলের প্রতিহিংসার রাজনীতির কড়া সমালোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'প্রধান বিরোধী দলের নেত্রী হিসেবে একদিন ১৪৪ ধারার বিরুদ্ধে আমি সিঙ্গুরে একা একা ঢুকতে চেয়েছিলাম। ঢুকতে তো দেওয়া হয়নি উপরন্তু সেদিন খুব উদ্ধত প্রশাসনিক ব্যবহারে অপমানিত ও অসম্মানিত হই।' সত্যি অবাক হতে হয় যখন দেখি সেই একই নেত্রী পুলিশ এবং প্রশাসনকে ব্যবহার করে রাজ্যে বিরোধী দলের নেতাদের চরম হেনস্থা করছেন। দিলীপবাবু স্পষ্টই বলেছেন, এই হামলা পূর্ব পরিকল্পিত। সে জন্যই নাগরিক সভামঞ্চে আমাদের সামান্যতম পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়া হয়নি। তৃণমূল দলের সৌজন্যে বাংলার রাজনীতি এখন হিংসাশ্রয়ী। অদূর ভবিষ্যতে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারাও বাংলায় এসে হেনস্থা হয়রানির শিকার হলে অবাক হবেন না।

পূজার উৎসবের সময় বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ষড়যন্ত্র করেছে বলে মমতা এবং তাঁর দল লাগাতার প্রচার চালায়। অথচ দেখা গেল তেমন কিছু সারা রাজ্যের কোথাও হয়নি। প্রশ্ন হচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী এমন অপপ্রচার করলেন কেন? এক কথায় এর উত্তর বিজেপিকে আগাম সাম্প্রদায়িক দল ঘোষণা করে বিজেপিকে জনবিচ্ছিন্ন করা। দিদিমণি বাংলার মানুষকে বোকা বানাতে চেয়েছিলেন। বাংলার মানুষ তাঁর মিথ্যা ও অপপ্রচারের রাজনীতি চিনতে ভুল করেননি। প্রমাণ হয়েছে, হিন্দু-মুসলমানের বিভেদের রাজনীতি তৃণমূলই করে। বিজেপি নয়। আর সেই জন্য সারা দেশের ১৩টি রাজ্যে এখন বিজেপি একক গরিষ্ঠতায় ক্ষমতায় আছে। শুধু তাই নয়, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র ও অসমে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ বিজেপি প্রার্থীদের ঢেলে ভোট দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে বিজেপি সভাপতির উপর হামলায় যে সব দুষ্কৃতীরা যুক্ত ছিল তাদের অধিকাংশই মদন তামাং হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত এবং বর্তমানে জামিনে মুক্ত। তবে পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে যে দিলীপ ঘোষকে হত্যার উদ্দেশ্যে দুষ্কৃতীরা খুকরি হাতে বিক্ষোভে সামিল হয়েছিল। বিজেপি রাজ্য সভাপতির উপর হামলার আগাম গোয়েন্দা রিপোর্ট দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার অখিলেশ চতুর্বেদির কাছে ছিল। তবুও রাজ্য বিজেপির প্রথম সারির নেতাদের পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়া হয়নি। কেন? কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের উচিত তদন্ত করে দেখা। কারণ, আবার বলছি তৃণমূল আশ্রিত গুণ্ডারা ভবিষ্যতে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতাদের উপর হিংসাশ্রয়ী আক্রমণ করতে পারে। তখন কেন্দ্রীয় সরকার দায় এড়াতে পারবে না। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা রাজ্যের দায়িত্ব। এই যুক্তি আর যেখানেই হোক পশ্চিমবঙ্গে অচল।

চলতি বাংলায় একটা কথা আছে, ঘুঁটে পোড়ে আর গোবর হাসে। অন্যের হেনস্থায় যখন কেউ মজা পায় তখন সে বোঝে না যে তার কপালেও লাঞ্ছনা আছে। বিরোধী দলের অর্থাৎ কংগ্রেস এবং সিপিএম নেতৃত্ব পরোক্ষভাবে বিজেপি রাজ্য সভাপতির হেনস্থাকে সমর্থন করেছে। কংগ্রেসের আবদুল মান্নান এবং সিপিএম নেতা অশোক ভট্টাচার্য একই সুরে বলেছেন, দিলীপবাবু দার্জিলিং গিয়েছিলেন স্বাধীন গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনকে সমর্থন করতে। তাই পাহাড়বাসীরা তাঁকে পিটিয়েছে। পাহাড়ে শান্তি ফেরাতে যখন মুখ্যমন্ত্রী চেষ্টা করছেন তখন বিজেপি রাজ্য সভাপতি তা বানচাল করার চেষ্টা করতে দার্জিলিং সফরে গিয়েছিলেন। তাই পাহাড়ের সাধারণ মানুষ ক্ষিপ্ত হন। এই বিরোধী নেতারা উঠ পাখি। বালিতে মুখ গুঁজে ভাবে সে নিরাপদে আছে। তাঁরা ভুলে গেছেন তৃণমূল রাজত্বে কেউই সুরক্ষিত নয়। এই সহজ সরল কথাটা সিপিএম-কংগ্রেস নেতারা কেন বুঝতে পারছেন না জানি না। হয়তো তারা তৃণমূলের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে। একদা বামফ্রন্টের আমলে যেমন কংগ্রেস নেতারা হয়েছিলেন। ভারতীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলের নেতানেত্রীদের সুরক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব শাসক দলের। গণতন্ত্রের মহান ঐতিহ্য বিস্মৃত হয়েছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে মনে করিয়ে দিই সিঙ্গুর আন্দোলন চলাকালে তাঁকে বিডিও অফিসে দরজা বন্ধ করে বেধড়ক মেরেছিল সিপিএমের গুণ্ডা এবং দলদাস পুলিশ। সেই গুণ্ডারা এবং পুলিশ এখন তৃণমূলের দলদাস হয়ে বিজেপি নেতাদের পেটাচ্ছে। হিংসার এই রাজনীতি সিপিএমের পক্ষে শুভ হয়নি। বাংলার মানুষ ক্ষমতা থেকে পার্টিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। গুণ্ডা দিয়ে দল চালালে এই পরিণতিই হবে তৃণমূলের। গণতন্ত্রের প্রহরী হচ্ছে বিরোধী দল। বিরোধীদের লাঞ্ছিত করলে শাসক দলও লাঞ্ছিত হবে। হিংসা প্রতিহিংসারই জন্ম দেয়। আজ দিলীপ ঘোষ মার খেলে কাল মমতা মার খাবেন না এমন গ্যারান্টি দিতে পারবে না।

ভারত-জাপান মৈত্রী—এশিয়ার রাজনীতির সূর্যোদয়

ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়

সম্প্রতি জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে ভারত সফরে এসেছিলেন। ১৪ সেপ্টেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে তিনি বুলেট ট্রেনের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে ছিলেন। এক লক্ষ কোটির বেশি অর্থব্যয়ে ২০২২ সাল নাগাদ এই প্রকল্প শেষ হবে। জাপান খরচের সিংহভাগ বহন করবে। এই ঘটনা ভারত-জাপান মৈত্রীর একটি মাইল ফলক। জাপানের প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের দিনকয়েক আগে নরেন্দ্র মোদী চীনে গেছলেন— ব্রিকস সম্মেলনে চীন সমেত ব্রিকস-এর সদস্য রাষ্ট্রদের পাকিস্তানের জঙ্গি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়। এতদিন পাকিস্তানের দোসর চীন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মুখ খোলেনি। এদিক থেকে বিচার করলে পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে তার ঘনিষ্ঠ মিত্রদেশ চীনকে ভারত পাকিস্তানের জঙ্গি সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে শামিল করেছে। নরেন্দ্র মোদীর এই অভাবনীয় সাফল্য প্রশংসনীয়।

জাপানের সঙ্গে মিত্রতা ভারত সরকারের একমাত্র সাফল্য নয়। ইতিপূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছে। এছাড়া বিগত জুলাই মাসে মোদীর ইজরায়েল সফর ভারত-ইজরায়েল সম্পর্কে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। ইতিপূর্বে ভারত আরব-ইজরায়েল সংঘাতে আরব দেশগুলির প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল। কিন্তু এখন পশ্চিম এশিয়ায় ইসলামিয় সন্ত্রাসবাদের প্রধান ঘাঁটি। আবার ভারতের নিরাপত্তার পক্ষে প্রধানতম বিপদ হলো পাকিস্তানের মদতপুষ্ট ইসলামি জঙ্গিগোষ্ঠীদের তৎপরতা। কাশ্মীরে জঙ্গিদের কার্যকলাপে প্রধান উৎসাহদাতা পাকিস্তান।

সুদূর প্রাচ্যে জাপান এখন অন্য ধরনের আশঙ্কায় পরিবৃত। উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে জাপান উত্তরোত্তর শক্তি বৃদ্ধি করেছিল। প্রথমে কোরিয়া জাপানের দখলে আসে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে জাপান চীনের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের পর চীনে কমিউনিস্ট শাসন কায়েম হয়। আর কোরিয়াকে কেন্দ্র করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কমিউনিস্ট শিবিরের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। শেষ পর্যন্ত কোরিয়া দ্বিখণ্ডিত হলো। উত্তর কোরিয়ায় কমিউনিস্ট শাসন ও দক্ষিণ কোরিয়ায় অ-কমিউনিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থা বলবৎ হলো।

“সিঙ্গাপুরের পতনের পর জাপানের হাতে বন্দি ভারতীয় সেনাদের নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই অভূতপূর্ব কর্মোদ্যোগের কাণ্ডারি ছিলেন রাসবিহারী বসু। ১৯৪২-এর জুন মাসে ব্যাঙ্কক শহরে ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ (Indian Independence League) গঠিত হয়। রাসবিহারী যে সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামের ভিত্তি রচনা করেছিলেন তা পরিপূর্ণতা পেল নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে।”

উত্তর কোরিয়া এখন মারমুখী। পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রয়োগ করে শুধু সুদূর প্রাচ্য নয়, বিশ্বশান্তির পক্ষে বিপদ ডেকে এনেছে। সম্প্রতি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণসভায় মার্কিন রাষ্ট্রপতি উত্তর কোরিয়াকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছেন। কিন্তু উত্তর কোরিয়ার রণসম্ভার পার্শ্ববর্তী জাপানের নিরাপত্তার পক্ষে উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে।

শুধু উত্তর কোরিয়া নয়, চীনও জাপানের নিরাপত্তার পক্ষে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। প্রশান্ত মহাসাগরের সংলগ্ন দক্ষিণ চীন সমুদ্রে চীন নৌ-মহড়া চালাবার সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান রুষ্ট হয়। জাপানের প্রধানমন্ত্রী আবে ২০১৫-এর শেষের দিকে ভারতে এসে দক্ষিণ চীন সমুদ্রে নৌ-চলাচলের অবাধ অধিকারের দাবি তুলে ধরেন। এরপর ভারত, জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফিলিপাইনস সাগরের উপর যৌথ নৌ-মহড়া চালায়। নৌ চলাচলের অবাধ অধিকার সুনিশ্চিত করতে এই মহড়ার আয়োজন হয়। মোদী সরকার ভারতের পূর্বদিকে দৃষ্টি (Look East) নিক্ষেপের নীতিতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। তাই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে সু-সম্পর্ক মজবুত করার চেষ্টা চলছে।

ভারত-জাপান মৈত্রীর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট :

ভারত, চীন ও জাপান এশিয়ার এই তিনটি দেশেই প্রাচীনকাল থেকে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। আধুনিককালে এই তিনটি দেশে তিন ধরনের ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া দেখা যায়। ভারত পুরোপুরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিয়ন্ত্রণে আসে। চীন স্বাধীন দেশ হিসেবে অস্তিত্ব বজায় রাখলেও সেখানে অপ্রত্যক্ষভাবে পাশ্চাত্য দেশগুলি ঔপনিবেশিক অনুপ্রবেশ কায়েম করে। কিন্তু জাপান বিস্তারনীতির

পথে ধাবিত হয়। ১৯০৪ সালে রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপান জয়লাভ করে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নিজেকে জাহির করল। সমস্ত প্রাচ্য জগতে জাপানের সাফল্য প্রবল উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।

আর বিশ শতকের গোড়া থেকেই ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী মুক্তিসংগ্রাম উদ্বেল হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যেই ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে শিকাগোতে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দের অলৌকিক ভূমিকা দেশবাসীর মনে শিহরণ সৃষ্টি করল। পরাধীন ভারতবাসী দাসত্বজনিত হীনমন্যতার গ্লানি কাটিয়ে স্বাভিমানবোধে বিভোর হলো। এই পরিবেশে ভারতে এলেন জাপানি মনীষী কাকুজো ওকাকুরা। তিনি ছিলেন একাধারে বুদ্ধিজীবী, শিল্পবিশারদ ও জাতীয়তাবাদী। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তিনি মিলিত হলেন। আর এই সঙ্গে নিবেদিতার সংস্পর্শে আসেন। তাঁর বিখ্যাত লেখা The Ideals of the East। এই গ্রন্থে এশিয়ার ঐক্যের বাণী বিধৃত হয়। ওকাকুরা ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে আরও সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান। চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে ভারত-জাপান মৈত্রীর অগ্রদূত ছিলেন ওকাকুরা। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ জাপানে গিয়ে তাঁর স্মৃতিতে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জানান।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বিশেষ ভূমিকা নেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান যুদ্ধে যোগ দেয়নি, নিরপেক্ষ ছিল। তাই প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরা জাপানে যাতায়াত শুরু করে। বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ভারতে সেনাবাহিনীর অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা নেন। কিন্তু এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় তিনি ছদ্মবেশে জাপানে চলে যান। লালা লাজপত রায় যুদ্ধের সময় ভারতে ফেরার অনুমতি পাননি। তিনি কিছুদিন জাপানে কাটিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। ১৯১৫ সালের ২৭ নভেম্বর হেরম্ব গুপ্ত, রাসবিহারী বসু ও লালা লাজপত রায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিষয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করেন। বহু জাপানি এই সভায় যোগদান করেন। জাপানি জাতীয় পতাকা ওড়ানো হয় এবং জাপানের জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়। সভায় ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অমানবিক দিকগুলি তুলে ধরা হয়। লালাজীর আবেগমথিত ভাষণ জাপানি শ্রোতাদের হৃদয় উদ্বেলিত করে। ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় বিপ্লবীদের জাপান থেকে বিতাড়িত করার জন্য চাপ সৃষ্টি করলেন। লালাজী ও হেরম্বগুপ্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চলে গেলেন। আর রাসবিহারী অজ্ঞাতবাসে বছরকয়েক কাটিয়ে আইজো সোমা নামে এক জাপানি ব্যবসায়ীর কন্যাকে বিয়ে করলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি জাপান সহানুভূতিসম্পন্ন হলেও তার কোনও সরাসরি ভূমিকা ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতে ব্রিটিশ শাসন উৎখাতের জন্য সশস্ত্র সামরিক অভিযানে উৎসাহ ও সহযোগিতা দিতে জাপান এগিয়ে আসে। মনে রাখা প্রয়োজন জাপানের সামরিক আঘাতে সমগ্র দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ব্রিটিশ, ফরাসি ও ডাচ শাসনের অবসান ঘটে। সিঙ্গাপুরের পতনের পর জাপানের হাতে বন্দি ভারতীয় সেনাদের নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই অভূতপূর্ব কর্মোদ্যোগের কাণ্ডারি ছিলেন রাসবিহারী বসু। ১৯৪২-এর জুন মাসে ব্যাঙ্কক শহরে ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ (Indian Independence League) গঠিত হয়। রাসবিহারী যে সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামের ভিত্তি রচনা করেছিলেন তা পরিপূর্ণতা পেল নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে। ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃত্বে আসীন হলেন। সুভাষচন্দ্র রাসবিহারী বসুকে পূর্ব এশিয়ায় 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জনক' বলে শ্রদ্ধা জানালেন। এরপর গঠিত হলো আজাদ হিন্দ সরকার (অক্টোবর ১৯৪৩)। জাপান সমেত আটটি দেশ এই সরকারকে স্বাগত জানায়। তারপর কী ঘটল তা সবারই জানা। দিল্লি চলো ও জয়হিন্দ রণধ্বনি শুধু আজাদ হিন্দ সেনানীদের নয়, পরে তা সমগ্র দেশ জুড়ে শিহরণ সৃষ্টি করে।

একটা প্রশ্ন উঠতে পারে সুভাষচন্দ্র কি জাপানের সঙ্গে মিত্রতা করে ভুল করেছিলেন? কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের আঘাতে এশিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকায় পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের ইমারত ধসে পড়েছিল। বার্মা, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম সর্বত্রই জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের দামামা বেজে উঠেছিল। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল থেকে পদানত এশিয়ার দেশগুলির মুক্তি সাধনার পথ প্রশস্ত হয়েছিল। তবে জাপানের মস্ত ভুল হয়েছিল, প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় মার্কিন নৌঘাঁটি পার্ল হারবারের উপর বোমা বর্ষণ। এ ঘটনা না ঘটলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে জড়িত হোত না। আর মার্কিন রণসম্ভারের কাছে জাপানকে নতিস্বীকার করতে হয়।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর কয়েক বছর জাপান অচ্ছুত ছিল। ১৯৫১ সালে সানফ্রানসিস্কো চুক্তির মাধ্যমে জাপানে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম হয়। এদিকে চীনে কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় জাপানের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করে। অন্যদিকে ভারত নেহরুর জমানা থেকে চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সখ্য গড়ে তুলে নিজের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে। পাকিস্তান মার্কিন সাহায্য নিয়েই ভারত-বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। প্রধানমন্ত্রী মোদী নেতিবাচক ভ্রান্ত নীতি থেকে সরে এসে জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমান্তরালভাবে বোঝা পড়ায় এসেছেন। একদিকে ব্রিকস্-এর জোট, আর অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের প্রতি সহযোগিতার সম্পর্ক ভারতের অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক। ভারতের এই গতিশীল বিদেশনীতির প্রতীক বুলেট ট্রেন। আর এই ট্রেন ভারত-জাপান পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার প্রতীকী পদক্ষেপ।

(লেখক পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লেখ্যাগার-এর প্রাক্তন নির্দেশক)

রোহিঙ্গা সমস্যা ও তার সমাধান

রবীন্দ্রনাথ দত্ত

গত কয়েক বছর ধরে মায়ানমারে বৌদ্ধ এবং রোহিঙ্গা মুসলমানদের মধ্যে যে সংঘর্ষ চলছে তা নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন প্রকার মতামত প্রকাশ করছেন। তার মধ্যে অধিকাংশই বিভ্রান্তিমূলক। যেহেতু বিশ্বে ৫৬টি মুসলমান দেশ রয়েছে এবং বৌদ্ধদের থেকে তারা অর্থে এবং প্রচারে বলীয়ান তাই তাদের (মুসলমানদের) মিথ্যা প্রচারে জনসাধারণ বিভ্রান্ত হচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি আমার প্রতিবেদন স্বহৃদয় পাঠক পাঠিকাদের সমীপে নিবেদন করছি।

মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের মানবিকতা এবং অনুকম্পা দেখাতে গিয়ে আরাকান নামক একটি বৌদ্ধ রাজ্য কীভাবে মুসলমান দেশে পরিণত হয়েছে তার বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করছি। বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রামের দক্ষিণপূর্ব সীমান্তে অবস্থিত আরাকান মায়ানমারের অন্তর্গত একটি রাজ্য। এই রাজ্যের রাজারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন, এখানে তারাই প্রথম বুদ্ধমূর্তি এবং প্যাগোডা স্থাপন করেন। আরাকানের প্রাচীন ইতিহাস 'বাজোয়াং' সূত্রে জানা যায়, রাজা মহৎ ঈঙ্গচন্দ্রের (৭৮৮-৮১০) রাজত্বের শেষ দিকে আরাকানের নিকটবর্তী রামরি দ্বীপের নিকটে আরব জলদস্যুদের একটি বাণিজ্য জাহাজ ডুবে যায়। তাতে অধিকাংশ জলদস্যু জলে ডুবে মারা যায়। যে কয়জন জীবিত ছিল তারা আরাকানে এসে উপস্থিত হয়। রাজার সৈন্যসামন্তরা তাদের বন্দি করে রাজদরবারে উপস্থিত করলে রাজা তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে স্বীয় রাজ্যে বসবাসের অনুমতি দেন। রাজার অনুমতি প্রাপ্ত এই এই আরব জলদস্যুরাই আরাকানে বসতি স্থাপনকারী প্রথম মুসলমান জনগোষ্ঠী। পরবর্তীকালে তারা স্থানীয় রমণীদের বিবাহ করে আরাকানে ইসলাম চাষাবাদ আরম্ভ করে।

এরপর পঞ্চদশ শতাব্দীতে আরাকানে অভাবনীয় ভাবে মুসলমান অনুপ্রবেশ পরিলক্ষিত হয়। ধীরে ধীরে আরাকানে মুসলমান অত্যাচারীদের দ্বারা নারী অপহরণ, ধর্ষণ, বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুসলমানদের চাপে আরাকান রাজারা নিজেদের বৌদ্ধনামের পাশাপাশি মুসলমান নামও গ্রহণ করতে বাধ্য হন। ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দের আরাকানের লিঙ্গায়ের বংশের শেষ রাজা মিনসুরাম ওরফে নরমিখলা ইসলাম কবুল করে সুলেমান শাহ নাম গ্রহণ করে লেপ্র নদীর তীরে রাজধানী স্থাপন করে একটি বৃহৎ মসজিদ নির্মাণ করেন যা সান্দিকা মসজিদ নামে বিখ্যাত। অতএব দেখা যাচ্ছে মাত্র কয়েকজন মুসলমান জলদস্যুকে মানবিকতার কারণে আশ্রয় দিয়ে কীভাবে একটি বৌদ্ধ রাজ্য মুসলমানদের পদানত হয়েছে।

ইংরেজদের বর্মা দখলের পর ভারত বর্মা সীমান্ত সে ভাবে সুরক্ষিত ছিল না। সেই সুযোগে আরাকান সংলগ্ন বর্মার বিশাল বনাঞ্চল চট্টগ্রামের মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের দখলে চলে যায়। তাদের মাতৃভাষা এখানে চট্টগ্রামের মুসলমানদের ভাষা, তারা বার্মিজ ভাষায় কথা বলতে পারে না। ইংরেজ সরকার ব্রহ্মদেশে চট্টগ্রামের মুসলমান অনুপ্রবেশ নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করেনি। ওইসব বনাঞ্চলে যেসব বার্মিজ বৌদ্ধ বাস করতো মুসলমান অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তারা বর্মার মূল ভূখণ্ডের দিকে পালিয়ে বসবাস আরম্ভ করে।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজরা যখন জাপানিদের কাছে পর্যুদস্ত হয়ে বার্মা ছাড়তে বাধ্য হয় তখন প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ওই অঞ্চলে ফেলে আসে। ওই অস্ত্রশস্ত্র হাতে পেয়ে অনুপ্রবেশকারী মুসলমানরা প্রায় ৫০ হাজার বৌদ্ধকে হত্যা করে (সম্প্রতি চীন সরকার বলেছে এই সংখ্যা এক লক্ষও হতে পারে)। ইংরেজরা যখন ভারত ও ব্রহ্মদেশকে স্বাধীনতা দিয়ে চলে যায় তখন আরাকানের মুসলমানরা এবং ব্রহ্মদেশের অনুপ্রবেশকারী মুসলমানরা করাচি গিয়ে জিন্না সাহেবের নিকট তদ্বির করে ওই অঞ্চল পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়ার জন্য। এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে স্বাধীনতার পরে দেশের সীমানা নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার পরেও অসমের মুসলিম লীগ নেতারা আমাদের বাংলাভাষী অঞ্চলকে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। ১৯৪৭-এর নভেম্বর মাসে কাছাড় থেকে মুসলমানদের একটি প্রতিনিধি দল করাচি গিয়ে জিন্না সাহেবকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান যেন বাংলাভাষী কাছাড় এবং গোয়ালপাড়া জেলা পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উপরন্তু আবদুল সৈয়দ খাঁ নামে এক মুসলিম লীগ নেতা অসমের বাংলাভাষী অঞ্চলগুলিকে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তীব্র আন্দোলন আরম্ভ করেন। কাইদে আজম জিন্না বাংলাভাষী মুসলমানদের এই অনুরোধ প্রত্যাখান করেন। কারণ এমনিতেই বাঙালিরা পাকিস্তানের জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশ। এর পর আরও

সংখ্যা বাড়লে পুরো পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা বাঙালিদের হাতে চলে যাবে। কাইদে আজমের দূরদর্শিতা সত্ত্বেও পাকিস্তান দু'টুকরো হয়ে গেল।

দেশভাগের সময় ইংরেজরা পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশাল অংশ পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়ে যায়। যেখানে ৯৮ শতাংশ চাখমা বৌদ্ধের বাস ছিল। সেখানে মুসলমানদের অকথ্য অত্যাচারে বহু বৌদ্ধ চাকমা ব্রহ্মদেশ এবং ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর অত্যাচারের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। বৌদ্ধ বিতাড়ন এবং মুসলমান অনুপ্রবেশের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে এখন বৌদ্ধের সংখ্যা ৫০ শতাংশে নেমে এসেছে। এই মুসলমান অনুপ্রবেশ প্রতিহত করতে গিয়ে বার্মা সরকারের সঙ্গে রোহিঙ্গা মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। এই রোহিঙ্গা মুসলমানরা পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠনগুলি দ্বারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। নেট খুললেই দেখা যায় তারা রাইফেল হাতে লম্ফঝম্ফ করছে। তারা গত ২৫ আগস্ট ৩০টি থানা এবং ৯টি সেনাছাউনি ধ্বংস করে দিয়েছে। ফলে বার্মা সেনারা ব্যপকহারে সামরিক অভিযান চালায়। এতে বহু মুসলমান ওখান থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে এবং অন্যান্য দেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। মুসলমানদের জানা উচিত ছিল ইট ছুঁড়লে পাটকেল খেতে হয়। মুসলমান দুনিয়া চিৎকার আরম্ভ করেছে ব্রহ্মদেশ সরকার মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে। আমার প্রশ্ন, ১৯৫০ সালে যখন পূর্ব পাকিস্তান সরকার তিন মাসে ৫০ লক্ষ বাঙালি হিন্দুকে বিতাড়িত করেছিল তখন এই মিঁয়াভাইরা কোথায় ছিলেন?

সম্প্রতি কয়েকদিন পূর্বে রোহিঙ্গা বিতাড়নের বিরুদ্ধে কলকাতায় মুসলমানরা এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে এবং তাতে এক লক্ষ লোকের সমাবেশ হয়। ১৯৫০ সালের হিন্দু বিতাড়নের কথা ছেড়েই দিলাম, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সময় খানসেনারা ৩০ লক্ষ বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানকে অকথ্য অত্যাচার করে হত্যা করে, সাড়ে চার লক্ষ নারী ধর্ষিতা হন। তখন কেন কলকাতার মিঁয়াভাইরা চুপ করেছিলেন? সেদিন তাদের বিবেক কোথায় বন্ধক দেওয়া ছিল? ওই সময় পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মুসলমান নেতারা দলমত নির্বিশেষে একত্রিত হয়ে কলকাতাস্থ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতাদের সঙ্গে মোলাকাত করে আচ্ছেলাম ওয়ালাহেকুম সম্বোধন করে তাদের পাকিস্তান ভাঙার চক্রান্ত থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করে। বিতর্ক এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে তা ধস্তাধস্তিতে পর্যবসিত হয়। নিজের জাতভাই বাঙালিদের জন্য তাদের দরদ নেই, এখন রোহিঙ্গাদের জন্য তাদের হৃদয় 'বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা'য় পযবসিত হচ্ছে।

খবর আছে প্রতি বছর বাংলা দেশে ২৫ ডিসেম্বর কাইদে আজম মহম্মদ আলি জিন্নার জন্মদিবসে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পর আরম্ভ হয় জ্বালামুখী হিন্দু বিদ্বেষী তথা ভারত বিদ্বেষী বক্তৃতার প্রতিযোগিতা। বক্তৃতার শেষে তার নামে শপথ নিয়ে বলা হয় ''হে মুসলমান ভাইরা! যদিও তিনি আমাদের এতিম (অনাথ) করে দিয়ে বেহেস্তে চলে গেছেন (ইন্নালিল্লাহে ওবাহিনেরাজেউন), কিন্তু আজ তার এই জন্মদিনে তাঁর অখণ্ড বাংলাকে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত করার স্বপ্ন পূর্ণ করার জন্য আমরা খোদার বান্দা প্রতিটি মুসলমান আমরণ জেহাদ চালানোর শপথ নেব। যদি সমস্ত বাংলা না-ও পাই তবে গঙ্গার পূর্বতীর পর্যন্ত এবং জিন্না সাহেবের স্বপ্নের কলকাতাকে আমরা আমাদের করে নেবই। আল্লাহর দরবারে এখন আমরা তার (কাইদে আজমের) এই স্বপ্ন পূরণ করার জন্য মোনাজাত করব। ওখান থেকে কিছু হিন্দু অত্যাচারিত হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে বলে খবর আছে। মোদী সরকারকে বিপাকে ফেলতে রোহিঙ্গা মুসলমানরা মুখোশ পরে এই অত্যাচার চালাচ্ছে। সর্বশেষে যেসব সেকুলারবাদীরা রোহিঙ্গাদের ভারতে আশ্রয় দেওয়ার জন্য দালালি করছে, গঙ্গার পূর্ব পাড় পর্যন্ত যদি গ্রেটার বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে তারা কোথায় যাবেন? রোহিঙ্গাদেরও বাংলাদেশই আশ্রয় দিতে পারে। দেশভাগের পর হিন্দুরা যে সমস্ত সম্পত্তি ফেলে এসেছে সেখানে স্বচ্ছন্দে তাদের পুনর্বাসন হয়ে যাবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

একদিকে মুসলমান দুনিয়া রোহিঙ্গাদের জন্য কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে, অন্যদিকে সৌদি রাজপুত্ররা তাদের নিজস্ব বিমানে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা দামি গাড়ি বাহন করে লন্ডনে গিয়ে ঈদের বাজার করতে ব্যস্ত। কোনো গাড়ি সোনার জলে রঙ করা কোনোটা সম্পূর্ণ সোনার পাতে মোড়া, লন্ডনের রাস্তায় যখন ওইসব গাড়ি দাঁড়ায় তখন সেখানকার ধনীর দুলাল এবং চিত্রতারকারা তাতে হাত বুলিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করে। ■

রোহিঙ্গা নিয়ে নেতিবাচক রাজনীতি দেশের স্বার্থের পরিপন্থী

কে. এন. মণ্ডল

ভারতে চলমান অনুপ্রবেশ সমস্যায় রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগের ফলশ্রুতিতে, পূর্ববাংলা থেকে হিন্দু শরণার্থী আগমনের প্রক্রিয়া আজও বহমান, সঙ্গে রয়েছে লক্ষ লক্ষ মুসলমান অনুপ্রবেশ পশ্চিমবাংলার সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে। ফলে মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুর, নদীয়া এবং দুই ২৪ পরগনা জেলায় জনসংখ্যা বিন্যাসের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে নানা রকম সামাজিক ও ধর্মীয় সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এমতাবস্থায়, ভারতে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ উদ্বেগ বাড়িয়েছে।

সরকারি হিসেব অনুযায়ী, ইতিমধ্যেই অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গাদের সংখ্যা ৪০ হাজার ছাড়িয়েছে, যাদের বেশি সংখ্যক ঘাঁটি গেড়েছে জম্মু কাশ্মীরে। মায়ানমার থেকে হাজার হাজার মাইল রাস্তা পেরিয়ে জম্মুতে গিয়ে রোহিঙ্গাদের পৌঁছানোর যোগসূত্রের পিছনেই রয়েছে সরকারি উদ্বেগের মূল কারণ। জম্মুতে স্থায়ী ক্যাম্পে ওদের দেখভালের সুব্যবস্থা রয়েছে এবং গোয়েন্দা সূত্র অনুযায়ী পাকিস্তানের আইএসআই মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবা ও জইশ-ই-মহম্মদের নেতাদের ওই সকল শিবিরে নিয়মিত আনাগোনা। শুধু তাই নয়, ওই জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি আরাকান-রোহিঙ্গা সালভেশ্‌ন আর্মির (আরসা) সঙ্গে যুক্ত হয়ে মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশে নাশকতার কাজে সহায়তা করছে। এ সমস্ত কারণেই, ভারত সরকার ভারতে রোহিঙ্গা অবস্থান দেশের নিরাপত্তার ব্যাপারে ক্ষতিকর মনে করে তাদের এদেশে আশ্রয় না দেওয়ার জন্য নির্দেশিকা জারি করেছে— যা পশ্চিমবঙ্গ সরকার মানবে না বলে জানিয়েছে— যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে। তৃণমূল সরকারের এই রোহিঙ্গা প্রীতি যত না মানবিক কারণে, তার থেকে অনেক

বেশি ভোটব্যাঙ্কে কুলোর বাতাস দিতে। যেহেতু রোহিঙ্গা শরণার্থী সকলেই মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত, তাই দু'ভাবেই এদের রাজনৈতিক পুঁজি করা সম্ভব। রোহিঙ্গাদের আশ্রয় প্রদান এবং তৎসহ কেন্দ্রের সঙ্গে এই ইস্যুতে যুদ্ধ ঘোষণা পশ্চিমবঙ্গের এক তৃতীয়াংশ মুসলমান ভোট যেমন অক্ষত রাখতে সাহায্য করবে— তেমনি রোহিঙ্গারা মূল স্রোতে ঢুকে তৃণমূলেরই ভোটব্যাঙ্ক স্ফীত করবে— যেমন করছে লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরা।

প্রসঙ্গত, নরেন্দ্র মোদী সরকার ভারতের নাগরিকত্ব আইনে সংশোধনী এনে অবিভক্ত ভারতের অঙ্গ বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং অন্যান্য সন্নিহিত অঞ্চল থেকে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, শিখ বা জৈন ধর্মের যে মানুষজন ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ভারতবর্ষে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন, তাদের ভারতের নাগরিকত্ব প্রদানের বিল সংসদে পেশ করেছে। এদের মধ্যে অধিকাংশই ৪ দশকের বেশি সময় ধরে স্ত্রী-পুত্র পরিজন নিয়ে বসবাস করছেন পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলা এবং কলকাতা শহরের আশেপাশে সরকারি কোনো সাহায্য ছাড়াই। খালপাড়ে, নদীর বাঁধে, রেল লাইনের ধারে এবং বস্তি এলাকায় সহায় সম্বলহীন জীবনযাপন করে যাচ্ছেন এই আশায়, তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ভারতের মূলস্রোতে যুক্ত হবে। কিন্তু তৃণমূল-সহ কিছু কিছু রাজনৈতিক দলের বিরোধিতার কারণে এই বিলটি আজও আইনে রূপ নিতে পারেনি, যা তাদের হতাশ করছে। অথচ, বামপন্থীরা অতীতে এবং বর্তমান তৃণমূল দলটি তাদের ভোটের পরিচয় পত্র পেতে সাহায্য করছে, ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করার জন্য। নাগরিকত্ব পেলে এদের রাজনীতির ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করা বা ভীতি প্রদর্শন এমনকী বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর হুমকি কাজ করবে না— এই বিবেচনাই কি নাগরিকত্ব বিলের বিরোধিতার কারণ, না এদের দিলে মুসলমানদেরও নাগরিকত্ব দিতে হবে— এই ধুয়ো তুলে মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক অক্ষত রাখার চেষ্টা? রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানো যাবে না— এই নীতির প্রবক্তাদের মানবতার রথ বাংলাদেশি হিন্দুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রসঙ্গে থেমে যায় কেন? তুরস্কের সমুদ্র উপকূলে ভেসে উঠা আয়লান কুর্দির মৃতদেহের ছবি যে বিবেককে নাড়া দেয়, তারা কেন বাংলাদেশে মুসলমান মৌলবাদীদের হাতে ধর্ষিত যুবতীদের ছবি বা কৃপাণের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত উলঙ্গ শিশুদের ছবি নেটে/ওয়েভে ভেসে উঠলেও চুপ মেরে যায়? এর কারণ কি ওই শিশুরা দরিদ্র নিম্নবর্গের এবং হিন্দু সমাজভুক্ত বলে? এ প্রসঙ্গে মানবতাবাদী লেখিকা তসলিমা নাসরিনের মন্তব্যই কি সঠিক— 'মুসলমান মৌলবাদীদের বিরুদ্ধ-চারণের থেকে হিন্দু মৌলবাদের সমালোচনা অনেক বেশি নিরাপদ।'

একথাগুলি একারণেই প্রাসঙ্গিক— বর্তমানে মেকি ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীদের চারিদিকে রমরমা, কারণ এক ধরনের সংবাদমাধ্যম তাদের গরিমান্বিত এবং ভারতের জাতীয়তাবাদী ভাবধারাকে ক্ষতবিক্ষত করতে

মরিয়া। কে কত বেশি হিন্দু, হিন্দুত্ব এবং কেন্দ্রের শাসক দল এবং তার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে জনমানসে হেয় প্রতিপন্ন করতে পারবে তার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ। দেশের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করে তার কর্তৃত্ব খর্ব করে ভারতকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোণঠাসা করার আন্তর্জাতিক চক্রান্তে শামিল হয়েছে এক ধরনের সংবাদপত্র এবং বিদেশি সাহায্যপুষ্ট রাজনীতির কারবারিরা। সুগতবাবুর মতো বিদ্বজ্জন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর রাজনৈতিক দর্শন সম্পর্কে কটাক্ষ করতে গিয়ে হিন্দু মহাসভার ১৯৪৭-এর পঞ্জাব ও বাংলাভাগের প্রসঙ্গ তুলেছেন এবং সমালোচনা করেছেন একটি সাম্প্রতিক নিবন্ধে। একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, ওঁর ঠাকুরদা শরৎবাবুর প্রস্তাবিত যুক্ত সার্বভৌম বাংলা বাস্তবায়িত হলে সবচেয়ে খুশি হতেন কলকাতা দাঙ্গার নায়ক সুরাবর্দী এবং পাকিস্তানের জনক মোহম্মদ আলি জিন্নাহ্। জিন্নাহ্ খোলাখুলিভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন, সুরাবর্দী-শরৎবাবুর এ প্রস্তাবে তার অমত নাই— কারণ সেক্ষেত্রে দুটি পাকিস্তান পাবে মুসলমানরা, আর কলকাতা হারাবে হিন্দুরা। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এবং সেদিনের হিন্দু মহাসভা চাপ সৃষ্টি না করলে আজ পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী হিন্দুদের অবস্থা হোত বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে আসা কোটি কোটি হিন্দু এবং যোগেন মণ্ডলের মতো। সুগতবাবুদের বিদেশে ব্যবস্থা আছে— সুতরাং মাভৈঃ।

পৃথিবীর মানচিত্রে সম্ভবত ভারতই একমাত্র দেশ যা জন্মলগ্ন থেকেই স্ববিরোধিতায় ভুগছে। দ্বিজাতি তত্ত্বে জন্ম নিয়েও ধর্মনিরপেক্ষতা যেন সোনার পাথর-বাটি। অখণ্ড ভারতের অ- মুসলমানরা, যারা ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়াই ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তারা যেমন অলিখিত স্বীকৃতি পেয়েছেন ভারতবর্ষে এসে স্বাধীনতার ফল ভোগ করার, আবার সরকার বিরোধীরা তাদের ভোটব্যাঙ্ক স্ফীত করতে সওয়াল করেন অ-ভারতীয় মুসলমানদেরও নাগরিকত্ব প্রদানের জন্য। এই নিবন্ধকার মনে করেন, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ভারতীয় নাগরিকের জন্য কোনো বৈষম্য না করে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ থেকেও, বিদেশিদের নাগরিকত্ব প্রদানে বৈষম্য সৃষ্টি করা যায়। ভারত রাষ্ট্রের জন্মের মধ্যেই ভারতের বাইরে বসবাসকারী ব্রিটিশ ভারতীয় হিন্দুদের অভিবাসনের ক্ষেত্রে বৈষম্য করার সংস্থান রয়েছে— নরেন্দ্র মোদীর সরকার শুধু তাদের ঐতিহাসিক অধিকার ফিরিয়ে দিতে অগ্রসর হয়েছেন। এক্ষেত্রে দরকার বলিষ্ঠ সরকারি পদক্ষেপ ও দৃঢ়তা এবং তা করতে হবে জাতীয় নিরাপত্তা ও স্বার্থ বজায় রেখে।

ইতিহাস বিস্মৃত একটি জাতি কখনই গৌরবের শিখরে পৌঁছাতে পারে না— ইতিহাসই ঐতিহ্যের ধারক এবং অনুপ্রেরণার স্থল। সাম্প্রতিক চীন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে এই নিবন্ধকারের মনে হয়েছে ভারত আর চীনের মধ্যে ব্যবধান তৈরি করেছে ভারতীয়দের ইতিহাস-বিচ্ছিন্নতা। একটি দেশের সার্বিক অগ্রগতি ও উত্থান সম্ভব জাত্যভিমানের উপর ভর করে (National Pride), ইতিহাস সচেতনতা এবং ঐতিহ্যের প্রতি গর্ববোধের মাধ্যমে। শুধু চীন কেন, পাশ্চাত্যের বহু দেশ আজ উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছে এই জাত্যভিমানে সওয়ার হয়ে— জাতীয় স্বার্থ এবং দেশের নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে।

প্রসঙ্গত রোহিঙ্গাদের বিষয়ে মোদী সরকারের নীতি বাস্তবসম্মত। ভারতের নিরাপত্তার এবং অখণ্ডতার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক চক্রান্ত চলছে— সক্রিয় রয়েছে দেশি-বিদেশি সন্ত্রাসবাদীরা। তাই রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ ভারতের পক্ষে ঝুঁকিপূর্ণ হলে, তাদের অনুপ্রবেশে উৎসাহিত করা যায় না— এমনকী আশ্রয় প্রাপ্ত রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানোর সব রকম কূটনৈতিক প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে, কারণ এ ধরনের অনুপ্রবেশের ফলে ভারতে বিভিন্ন স্থানে জন- বিন্যাসের ভারসাম্য নষ্ট হলে সামাজিক ও ধর্মীয় অস্থিরতা সৃষ্টি হবে যার বহু নিদর্শন ইদানীংকালে আমরা পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যক্ষ করছি। ভারতের উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির রাজনৈতিক অস্থিরতারও মূলে রয়েছে ওই জন-বিন্যাসের ভারসাম্য নষ্ট। বাংলাদেশ থেকে দিনমজুরের কাজের নামে অনুপ্রবেশ করে অসম, নাগাল্যান্ড, মণিপুর ও মিজোরামে বহু বাংলাদেশি মুসলমান স্থানীয়দের বিয়ে-শাদি করে নতুন সংসার সাজিয়ে দুই-কুল রক্ষা করছে এমন উদাহরণ ভুরি ভুরি। অনুরূপভাবে মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশ, যা পূর্বে 'আরাকান' অঞ্চল নামে পরিচিত ছিল, সেখানে বহু বাংলাদেশি মুসলমান যুগ যুগ ধরে বসবাস করছে। ধীরে ধীরে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে যখন স্থানীয়রা (বার্মিজ) তুচ্ছ সংখ্যালঘুতে পরিণত হলো, তখন রোহিঙ্গারা স্বশাসন দাবি করে। মায়ানমার সরকার যখন বিপদ সামলাতে কঠোর হয়, তখনই আরাকান রোহিঙ্গা সালভেশ্ন আর্মির জন্ম হয়। সংঘর্ষ তীব্রতর হলে রোহিঙ্গারা আক্রমণের শিকার হয়ে দেশত্যাগ করতে থাকে। বৌদ্ধরা নিজভূমে নগণ্য সংখ্যালঘু হয়ে যাওয়ার ভিতরেই নিহিত রয়েছে রোহিঙ্গা সমস্যা, অনুরূপ অবস্থা পশ্চিমবঙ্গে বা ভারতের কোনো অঞ্চলে যাতে তৈরি না হতে পারে, তার জন্য সকলকে সতর্ক থাকতে হবে।

(লেখক ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য প্রবন্ধক)

With Best Compliment from-

A

Well Wisher

দীপাবলীর শুভেচ্ছা সহ—

সুনীতা ঝাওয়ার

কাউন্সিলার ও বিজেপি নেত্রী
৪২ নং ওয়ার্ড, কোলকাতা পুরসভা

কিশান ঝাওয়ার

উত্তর-পশ্চিম কোলকাতা জেলা সভাপতি
বিজেপি

Lotus Rang Udyog

DEALS IN - DYES & CHEMICALS

26/4-A, Armenian Street.
Kolkata - 700 001

Phone : (O) 2268-9552,

2268-2717, 2218-2931

E-mail : rangjeet.Lunia@yahoo.in

Wish you very happy :

BISHWANATH DHANANIA

With Best Compliment-

Ecomoney Insurance Brokers Pvt. Ltd.

মাতৃপীঠ কামাখ্যা

চন্দ্রভানু ঘোষাল

প্রথমেই বলে রাখা ভালো, এই নিবন্ধ লেখকের কামাখ্যাপীঠ দর্শনের সৌভাগ্য এখনও হয়নি। তবে দেবীর স্নেহ-বাৎসল্যের গল্প শোনার অভিজ্ঞতা অনেকবার হয়েছে। এইসব গল্পের কথক অনির্বাণ ভারতী। অনির্বাণ পেশায় অধ্যাপক। সেইসঙ্গে কামাখ্যাতন্ত্রের একজন নিষ্ঠাবান গবেষকও। মায়ের কথা একবার ওঠার অপেক্ষা, অনির্বাণ বলেন, 'অর্থ, যশ, সন্তান— মানুষের কত কামনা! মায়ের চৌকাঠে একবার মাথা ঠেকালেই সব পূর্ণ।'

গুয়াহাটির পশ্চিমে নীলাচল পাহাড়ের চূড়া দৃষ্টিসীমায় ধরা দেওয়া মাত্র মন ভক্তিতে দ্রব হয়ে ওঠে। এখানেই কামাখ্যা দেবীর মন্দির। ভক্তরা বলেন একান্নপীঠের শ্রেষ্ঠ পীঠ এই কামরূপ-কামাখ্যা। দশমহাবিদ্যা একসঙ্গে অবস্থান করেন এই পীঠে। ভারতের নানা প্রান্ত থেকে অগণিত তীর্থযাত্রী মায়ের দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত হন। দূর থেকে শোনা যায় তাঁদের সমবেত কণ্ঠস্বর, 'জয় কামাখ্যা মাঈ কী জয়!'

মন্দিরের গঠনশৈলী :

ওপর থেকে দেখলে কামাখ্যা মন্দিরের চারটি প্রকোষ্ঠ পাওয়া যাবে। গর্ভগৃহ, কালান্ত, পঞ্চরত্ন এবং নৃত্যমণ্ডপ। অষ্টম থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে বহুবার মন্দিরের সংস্কার হয়েছে। ফলত, মন্দিরের গঠনরীতিতে মিশ্রশৈলীর আভাস পাওয়া যায়— যার নাম নীলাচল শৈলী। মন্দিরের ভিতের গড়ন যোগচিহ্নের মতো, তার ওপর অর্ধগোলাকৃতি মন্দিরচূড়া।

গর্ভগৃহ :

হিন্দুদের প্রাচীন পঞ্চরথ রীতিতে তৈরি কামাখ্যা মন্দিরের গর্ভগৃহটি। পুরাণে কথিত, কামাখ্যায় সতীর মাতৃঅঙ্গ পড়েছিল। এখানকার গর্ভগৃহটিও মাতৃঅঙ্গের আকৃতির। অন্ধকার, ঢালু এবং দশ ইঞ্চির মতো গভীর। কামাখ্যার অন্য মন্দিরগুলির গর্ভগৃহও একই ধরনের।

কালান্ত, পঞ্চরত্ন এবং নৃত্যমন্দির :

মন্দিরে আরও তিনটি প্রকোষ্ঠ রয়েছে। পশ্চিম দিক থেকে প্রথমটির নাম কালান্ত। আটচালা শৈলীর এই প্রকোষ্ঠের সঙ্গে বিষ্ণুপুরের রাধাবিনোদ মন্দিরের মিল আছে। মন্দিরের সিংহদরজা উত্তরে, অহোমের দোচালা শৈলীতে তৈরি। কালান্তেও অবস্থান করছেন কামাখ্যা দেবী, তবে অপেক্ষাকৃত নবীন বিগ্রহে। কালান্তের পশ্চিমে রয়েছে পঞ্চরত্ন। পাঁচটি একইরকম দেখতে শিকারার ওপর একটি আয়তাকার ছাদ, এরই নাম পঞ্চরত্ন। পঞ্চরত্নের পশ্চিমে নৃত্যমন্দির বা নাটমন্দির। অহোম শৈলীর রংঘার ঘরানায় নির্মিত। ১৭৫৯ সালে রাজেশ্বর সিংহ এবং এবং ১৭৮২ সালে গৌরীনাথ সিংহ নাটমন্দিরের দেওয়ালে নানারকম চিত্র খোদাই করেন।

রহস্য এবং মাহাত্ম্য :

কামাখ্যা মায়ের কৃপা হলে লৌকিক পৃথিবীতে অলৌকিক ঘটনার বন্যা বয়ে যায়। কিন্তু মায়ের শক্তির প্রকাশ ঘটানোর জন্য বাহকের প্রয়োজন। তেমনই একজন বাহক ভোলা বাবা। গত দু'দশক ধরে অঘোরী সম্প্রদায়ের এই তান্ত্রিক মায়ের আশীর্বাদ মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসছেন। অনির্বাণ ভারতী বলেন, 'একবার অম্বুবাচী মেলায় ভোলাবাবার আশ্রমে আলাপ হয়েছিল অরুণ দাস এবং তার স্ত্রী মৈত্রীর সঙ্গে। সুস্থ সবল দুটি মানুষ, কিন্তু নিঃসন্তান। সন্তান কামনায় মায়ের কাছে ওরা এসেছিল। অরুণের মুখে শোনা, তন্ত্রমতে সিদ্ধ কারণবারিতে ভরা একটি বাঁদরের খুলি ভোলাবাবা এগিয়ে দিয়েছিলেন মৈত্রীর দিকে। সেই কারণবারি খেয়ে মৈত্রী মা হয়।'

ভোলাবাবার মতো অসংখ্য তান্ত্রিক প্রতি বছর অম্বুবাচীর সময় মায়ের কাছে আসেন। কথিত, এই সময় প্রকৃতি রজঃস্বলা হন। কৃষিকাজ বন্ধ থাকে। বন্ধ থাকে মন্দিরও। অনির্বাণ বলেন, 'এটা এমন একটা সময় যখন পরা এবং অপরা প্রকৃতি জেগে ওঠে।' জাগ্রত শক্তির টানে হাজির হন সাধু এবং গৃহীরা। নারীরা সংসারে সুখ চান, সন্তান চান। পুরুষ চায় অর্থ, যশ। এর উল্টোদিকে আবার অন্য ছবি। অনেকেই আসেন বশীকরণের জন্য। অনির্বাণ বলেন, 'এসব নিম্নস্তরের কাজ। বশীকরণ করলে তিনি আবার শক্তিসাধক কীসের!' ঠিকই তো, মায়ের কাছে চাইলেই যখন পাওয়া যায় তখন বশীকরণ করার দরকার কী! প্রতি বছর কামাখ্যা মন্দিরে যাদের ঢল নামে তারা মায়ের সন্তান। তারা শক্তির কৃপা চান, ব্যবহার করে কাজ হাসিল করতে চান না। ■

কালীতত্ত্বের সুলুকসন্ধানে

জয়ন্ত কুশারী

সংসারের তিনটি ভাব। উৎপত্তি, স্থিতি এবং বিনাশ। যিনি উৎপত্তির ব্যবস্থা করেন, তিনিই স্থিতির ব্যবস্থা করেন। তিনিই আবার বিনাশেরও ব্যবস্থা করেন। এই তিনরকমের ঘটনা একই সঙ্গে ঘটে চলেছে নানাভাবে। আসা, যাওয়া আর থাকা। সংসার মানেই হলো এই তিনটি ঘটনা। এই যে তিন রকমের ঘটনা নিয়ত ঘটছে বিশ্বজুড়ে, যাঁর দ্বারা ঘটছে তিনি হলেন কাল (পরম পুরুষ) এবং তিনিই কালী— পরমা প্রকৃতি। এই দুই তত্ত্বত এক, যিনি কাল, তিনিই কালী। কালের যে প্রকাশ তাই কালীভাব। প্রকাশ যাঁকে নিয়ে তিনিই কাল। যেখানে প্রকাশ অর্থাৎ কালীভাব সেখানে কাল যেন অপ্রকাশ। যখন কাল স্বরূপে তখন প্রকাশ রূপ কালীভাব থাকে কতকটা অপ্রকাশ। আসলে দুজনেই প্রকাশ বা অপ্রকাশ। আমরা ব্যবহারে এরকম বলি। বস্তুত মহাকালকে নিয়েই বা তাঁরই প্রকাশ কালীভাব। তাই মহাকালের শবরূপ অর্থাৎ স্তব্ধরূপ এঁরা কল্পনা করেছেন। কালকে প্রকাশ করতে গেলে কালীরূপ পাওয়া যায়। ইনি মহামায়া, চৈতন্যস্বরূপিণী অসুরদলনী, পাপধ্বংসকারিণী। সৃষ্টিতে মহাকালী, স্থিতিতে মহালক্ষ্মী, প্রলয়ে মহাসরস্বতী।

এই কালী শিবমহিষী। শিব ও শক্তিতে কোনও তফাত নেই। বিনা আধারে প্রকাশ হয় না। সেই আধার শবরূপী মহাদেব। প্রকাশে থাকে নানা বৈচিত্র্য। এই বৈচিত্র্যের প্রকাশ মহাকালীস্বরূপ। যেমন বীজের মধ্যে উদ্ভিদের সত্তা ধরা থাকে। সেইরূপ বৈচিত্র্যের প্রকাশের মধ্যে ধরা থাকে মহাকাল রূপ। যদি কেউ বৈচিত্র্য চায় তাহলে তাকে কালীর আরাধনা করতে হবে। অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে জড়িয়ে থেকেও যেখানে সব সম্ভাবনা স্থির হয়ে আছে সেখানে পৌঁছতে চাইলে তো শিবভাবে সাধনা করতে হবে। প্রকাশেই আমাদের জন্ম। এই প্রকাশেই আমাদের পক্ষে সহজ হবে মায়ের সঙ্গ। বহু রূপে বৈচিত্র্যের বিলাস যেখানে সংহত অবস্থায় আছে, যোগীরা সেখানে দৃষ্টি চালনা করেন।

আকাশের মতো রং তাই শ্যামা। যার ষোল বছর পূর্ণ হয়েছে। ষোলকলায় পরিপূর্ণ। পনেরো পর্যন্ত কলা ধ্বংসলীলা। বাড়ে কমে। ষোল যে কলা সেটা বাড়েও না, কমেও না। সেটা স্থির কলা। নিত্যকলা

সেটি। সেটি অমাকলা। যেমন শিবের ওপর শক্তির প্রকাশ। তেমনি অমাকলায় তাঁর স্থিরভাব। তখন শিব আর শক্তি এক হয়ে যায়। গভীর অমানিশায় যখন কালো একেবারে ঘনিয়ে আসে, মধ্যরাত্রে নিবিড় নিথর ঘন সূচীভেদ্য কালো অন্ধকার, যখন কেবলমাত্র নিত্যকলা আছে, সেই অবস্থায় শিব ও শক্তির সামঞ্জস্য হয়। যারা শক্তিসাধক, তাঁরা এই মুহূর্তে এই অমাকলায় ধ্যান করে শিবশক্তির সামঞ্জস্যে স্থিত হয়ে যান। অমাকলাতে যখন শিব ও শক্তি সমঞ্জস, তখন সেই ভাবেতে লীন হয়ে যাওয়াই কালীপুজো। সমস্ত বিলাস ও ঐশ্বর্যের মূর্তি হয়েও সমস্তটা শিবভাবে সংহত।

বিশ্বসৃষ্টির আগে একমাত্র কালীই বর্তমান ছিলেন এবং এঁর দ্বারাই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রসূত হয়েছে। এজন্য এঁকে আদ্যা বলা হয়ে থাকে। যে মহাশক্তি মহাকালের সর্বসংহারক শক্তির নিয়ন্ত্রক তিনিই কালী। উপনিষদের ঋষি এই মহাশক্তির স্বরূপ বর্ণনায় মন্ত্রোচ্চারণ করেছেন—

'ভাষাঽসমাদ্বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি সূর্যঃ।
ভীষাঽস্মাদগ্নিশ্চেকন্দ্রশ্চ। মৃত্যুধাবতি পঞ্চমঃ।।"

(তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ২।৮)

অর্থাৎ ব্রহ্মের ভয়ে বাতাস বইছে, সূর্য উঠছে এবং তাঁর ভয়ে অগ্নি, ইন্দ্র ও পঞ্চম মৃত্যু (কাল) নিজ লক্ষ্যে ধাবিত হচ্ছে। এই মহাশক্তিকে কঠোপনিষদ 'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্।' অর্থাৎ উদ্যত বজ্রের মতো অতি ভীষণ বলে বর্ণনা করেছেন।

কালশক্তি মহাপ্রলয়ে সমুদয় ধ্বংস করে কালীতে লীন হয়ে যায়। তখন তমোরূপিণী কালীই একমাত্র বর্তমান থাকেন। সৃষ্টির পূর্বে তমোরূপে একমাত্র বিদ্যমান ছিলেন, মহাদেবীর সেইরূপ অরূপ অবাঙ্মানসগোচর।

মৈত্রায়ণী শ্রুতিতেও স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই তমোগুণই তন্ত্রের আদ্যাশক্তি কালিকা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অতি সরলভাবে দেবী কালিকার স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন— 'ব্রহ্মাণ্ড উদরা মা জগদ্ধাত্রী।' তিনি ব্রহ্মময়ী, সিদ্ধিদাত্রী শক্তিস্বরূপিণী। নির্গুণ-নিরাকার হলো ব্রহ্ম। তাঁর তরঙ্গ হলো শক্তি। শক্তিতেই এই জগৎ সৃষ্টি হচ্ছে। স্থিতির সম্বল শক্তি। শক্তিই ধারণা। এই শক্তিতেই ব্রহ্মের লীলার প্রকাশ। শক্তির দর্পণে ব্রহ্ম প্রতিবিম্বিত। দর্পণ স্বরূপা শক্তি সহায় না হলে ব্রহ্মতত্ত্ব ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হবে না। মহাকালী সেই শক্তিস্বরূপা।

তিনি নানাভাবে লীলা করেন। তিনিই মহাকালী, নিত্যকালী শ্মশানকালী, রক্ষাকালী এবং শ্যামাকালী। মহাকালী ও নিত্যকালীর কথা তন্ত্রে রয়েছে। যখন সৃষ্টি হয়নি, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ ও পৃথিবী ছিল অস্তিত্বহীন। জগৎ ছিল সুনিবিড় আঁধারে মগ্ন, তখন কেবল 'মা' নিরাকারা মহাকালী মহাকালের সঙ্গে বিরাজ করেছিলেন। তন্ত্রের দৃষ্টিকোণে 'কালী' শব্দের আরও এক তাৎপর্য দেওয়া যেতে পারে। 'কলন' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে 'কালী' শব্দ যার অর্থ ক্ষেপ ও জ্ঞান— কলন সামর্থ্যের মধ্যে যে নামের সার্থকতা। পরাগতির দিক দিয়ে শিবের পাঞ্চকৃত্যকে কলনা বলে। এই পাঞ্চকৃত্য হলো ক্ষেপ, জ্ঞান প্রসংখ্যান, গতি ও নাদ। একে পঞ্চকলা বা কলনাও বলা হয়।

এখন এক নজরে দেখে নেওয়া যাক, সারাদেশ জুড়ে শক্তিবাদের বা শক্তি উপাসনার ধারাটি ঠিক কেমন? এক্ষেত্রে অন্যান্য উপাস্যদের অবস্থানই বা ঠিক কোথায়?

পশ্চিমবঙ্গে শুধু নয়, সারা দেশের প্রতিটি ঘরে আজও কোনও না কোনও দেবতার পূজা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দুর্গা বা কালী অথবা রাধাকৃষ্ণ কিংবা রামসীতার পূজায় মগ্ন হন সকলে। শিবদুর্গা পুজোর প্রচলনও উপাসনার ক্ষেত্রে চোখে পড়ার মতো। প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করে দেবদেবীর বা কুলদেবতার পূজার্চনা করার বিধিও শাস্ত্রসম্মত। কালীপূজা মুখ্যত বাঙালিরই পূজা। যদিও কালীপূজার সময় ভারতের অনেক প্রদেশে দেওয়ালি উৎসব অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে পালন করা হয়। নিত্য সকালে বাড়ির বৌ-রা বা মায়েরা ঠাকুরঘরে বসে গুরু-ইষ্টনাম স্মরণ করেন। কেউ বা নবগ্রহ স্তোত্রপাঠ আবার কেউ হনুমান চালিশা পাঠ করে নিজ মনকে পবিত্র করে চা পান করেন। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান প্রভৃতি অঞ্চলে লোকে কালী বা শক্তিদেবীর পূজার্চনা করলেও বঙ্গদেশেই কালীর আরাধনা মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়ে থাকে। সেদিক থেকে বলা যায় কালীপূজা বঙ্গদেশবাসীর জাতীয় পূজা। শাক্তপ্রধান পশ্চিমবঙ্গে কালীর নিয়মিত উপাসকের সংখ্যা অসংখ্য।

দক্ষিণাকালী বিগ্রহই সমধিক প্রচলিত। দেশের নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন প্রসিদ্ধ কালীমন্দিরের অধিকাংশ দেবীমূর্তিই দক্ষিণাকালী মূর্তি এবং ওইরূপ মূর্তি সবই শিলাময়ী। 'তন্ত্রসার' ও 'শ্যামারহস্য' গ্রন্থে দেবীপূজার নানারকম মন্ত্র ও ধ্যান সংকলিত আছে। সমস্ত শক্তির আধার মাতৃশক্তি।

আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা কালীকীর্তন বা শ্যামাসঙ্গীত বা ভক্তিমূলক কালীবিষয়ক গান শুনলে পরিতৃপ্তি লাভ করে। বাঙালির রক্তে ভাববিহ্বলতা প্রবল। বাস্তবক্ষেত্রে এই ভাবনার দোষ বা গুণ বিচারের স্থান এ প্রবন্ধ নয়। তবে ভাবের আতিশয্যের এক বড় গুণ যে তা অনুভূতিকে তীব্রতর করে। কলিযুগে ভক্তিমার্গই মানুষের অধ্যাত্ম সাধনার প্রকৃত পথ। ভক্তিপথেই সহজে ঈশ্বর মেলে। বাঙালি তাই বিশ্বজননীকে ভক্তি-অর্ঘ্যে অর্চনা করতে চায়। শব্দই ব্রহ্ম। ব্রহ্মজ্ঞানই সচ্চিদানন্দের বহিঃপ্রকাশ। সৎ, চিৎ ও আনন্দ নিয়েই ঈশ্বর। ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা।

যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তাই আছে এই দেহভাণ্ডে। 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।' পরমেশ্বর একমেব অদ্বিতীয়ম্। শক্তির যে নির্বিশেষ তত্ত্ব তাই-ই এই পরাতত্ত্ব। এই অবস্থায় কালীই ব্রহ্ম। তিনিই ব্রহ্মময়ী মা। 'চক্রবৎ পরিবর্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ।' সুখ-দুঃখের মধ্যেই মা কালী সমস্ত জীবের কল্যাণ করেন। 'জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।' পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রেম-ভক্তি-ভালবাসা থাকলেই ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আসা যায়।

বাঙালির ধর্মজীবন হতে দেখা যায়, প্রধান ভিত্তি মূর্তিরহস্য বা পূজা পদ্ধতি। দেবীমূর্তির রহস্য বিভিন্ন আগম শাস্ত্রে বা তন্ত্রে ছড়িয়ে আছে। অন্তর্দর্শন করতে তন্ত্রজ্ঞান খুবই প্রয়োজন। আজও সর্বস্থানে মা-কালী জগজ্জননীরূপে পূজিতা হচ্ছে।

(লেখক সর্বভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যা আকাদেমির অধ্যক্ষ)

‘মা তোর কত রঙ্গ দেখব বল’

তপোময় দাস

বাঙালির জীবনাচরণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িয়ে আছে মাতৃ উপাসনার পরম্পরা। বেঁড়াচাপার চন্দ্রকেতু গড় থেকে নবদ্বীপের পাণ্ডুরাজার ঢিপি— সর্বত্রই ব্যাপারটা লক্ষ্য করা যায়।

স্বামী পরাশরানন্দ বলেছেন ঃ ‘‘মাতৃসাধনা বঙ্গদেশের আপামর জনসাধারণকে করে রেখেছে ধর্মমুখী।’’ ঋক্‌বেদের দেবীসূক্তেই মাতৃশক্তি আদি শক্তিদেবী রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এর প্রথম ঋক্‌টি হলো ঃ ‘‘অহম্ রুদ্রেভির্ব সু শিশ্চ রামাহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ। অহংমিত্র বরুনোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা।।’’ অর্থাৎ (একাদশ) রুদ্র (অষ্ট) বসু, (দ্বাদশ) আদিত্য এবং বিশ্বদেবগণ রূপে আমিই নিখিল বিশ্বে পরিভ্রমণ করি; মিত্র ও বরুণ, ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বিনীকুমার দ্বয়কে আমি ধারণ করি।

ঋকবেদের রাত্রিসূক্তে যে, রাত্রিদেবী-র কথা বলা হয়েছে তিনিই হলেন ‘ব্রহ্ম মায়াত্মিকা’ এবং ‘পরমেশ লয়াত্মিকা’। অর্থাৎ দেবী এখানে ‘ব্রহ্মের মায়া’ এবং ‘পরমেশ লয়প্রাপ্তা’ হন বলা হচ্ছে। আরও পরবর্তীকালে উপনিষদে আমরা ‘উমা হৈমবতী’র সন্ধান পাচ্ছি। ‘কেনোপনিষদে’ যিনি বহু শোভমানা এবং হিমালয় কন্যা পর্বতবাসিনী এবং পর্বতকন্যা রূপে পার্বতী প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। এই উমা বা পার্বতী সমার্থক দেবী— তিনি হরজায়া এবং হিমালয় কন্যা। আজ বঙ্গদেশে যে দুর্গাপূজা হয় সেখানেও দুর্গা হলেন হরজায়া এবং হিমালয় কন্যা।

কপিল মুনি রচিত সাংখ্য দর্শনকে বাঙালির নিজস্ব দর্শন বলা হয়। এতে কপিলমুনি যে প্রকৃতির কথা বলেছেন, সেই প্রকৃতিই হয়ে উঠেছেন বাঙালির প্রাণের মাতা। এ প্রসঙ্গে বলতে হয় ঃ ‘‘সাংখ্যমতে পুরুষ অনেক, প্রকৃতি এক। প্রকৃতিই বিশ্বাত্মার মূর্ত প্রতিমা-মায়া।’’ সাংখ্য দর্শনের এই প্রকৃতিই তন্ত্রমতে দেবী কালিকার রূপ গ্রহণ করেছেন। তান্ত্রিকগণ মনে করেন— শিবই পরমাত্মা বা ঈশ শক্তি। তান্ত্রিকগণের কাছে দেবী কালিকার ব্যাখ্যা হলো—

‘‘ঐশীশক্তি মায়ারূপে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার করিতেছেন, ঈশশান্ত- শুভ্র-নির্বিকল্প ও নিরঞ্জন অবস্থায় পতিত রহিয়াছেন।’’ আবার কারো কারো মতে বৌদ্ধধর্মের শেষদিকে যখন তন্ত্রসাধনার শুরু হয় তখন বৌদ্ধধর্মের উপাসিতা দেবী হন ‘তারা’।

বাংলায় পালরাজাদের আমলে যখন বৌদ্ধধর্মের জোয়ার এসেছিল তখন দেবী তারা বঙ্গদেশে প্রবেশ করলেন এবং কালীর শ্রদ্ধা লাভ করলেন। পরম ভাগবত বৈষ্ণবগণ ‘রাধাতন্ত্র’ রচনা করে ওই তন্ত্রমতে বৈষ্ণব সাধনায় ব্রতী হয়ে থাকেন; অতএব ব্রজবিলাসিনী শ্রীমতী রাধিকাও তন্ত্রমতে একজন শক্তিদেবী।

‘রাধাতন্ত্র’-এ বলা হয়েছে যে— স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শক্তির উপাসক ছিলেন। বাংলায় চৈতন্যদেবের প্রভাবে যখন বৈষ্ণব ধর্মের জোয়ার এসেছিল তখন বাংলার শক্তি আরাধনা রাধাকে অবলম্বন করেই আবর্তিত হয়েছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। এমনকী বাংলার সহজিয়া বাউল সাধনাতেও শক্তি আরাধনা তথা মাতৃ আরাধনার কথা পাওয়া যায়। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিতে বাঙালির ধর্মাচরণ ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করলেও সমস্ত কিছুর কেন্দ্রে রয়েছে সেই মাতৃ সাধনার পরম্পরা। বলা যায়— আনুমানিক তিন হাজার বছর ধরে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে শক্তিদেবী এ যুগে এসে হয়ে গেলেন দুর্গা ও কালী। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন :

‘‘বেদে যাঁকে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বলা হয়েছে, পুরাণে তিনিই সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ, আর তন্ত্রমতে তিনিই সচ্চিদানন্দ শিব।’’ আর এই ব্রহ্মকে অবলম্বন করে বিরাট লীলাখেলা করে চলেছেন বিরাট এক শক্তি--- যিনি বঙ্গদেশে দুর্গা ও কালীরূপে পূজিতা হন।

বঙ্গদেশে মহাশক্তিকে প্রথমে ‘মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা রূপে পূজা শুরু হয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক থেকে বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। তবে এই রূপের প্রাচীনতম নিদর্শন মধ্যভারতের উদয়গিরিতে দ্বিতীয়

চন্দ্রগুপ্তের আমলে নির্মিত প্রস্তর মূর্তিতে পাওয়া যায়। এই মূর্তি খ্রি: চতুর্থ শতকে নির্মিত বলে মনে করা হয়। এখানে দেবী দ্বাদশভুজা ও বিভিন্ন অস্ত্রে সজ্জিতা।

বহু বাঙালির ঘরে দেবী কালিকা নিত্যদিন পূজা পান। দেবী কালিকাকে অবলম্বন করেই তন্ত্রসাধনা গড়ে উঠে ছিল। কোনো কোনো প্রাচীনগ্রন্থে দেবী শিবারূঢ়া নন, শবারূঢ়া। অসুর নিধনের পর অসুরগণের শব পদদলিত করে তিনি শবারূঢ়া। ইনিই কৌশিকী এবং চণ্ড-মুণ্ড তৃষাতুরা, চতুর্ভুজা, শিবারূঢ়া কালীকে আমরা দেখি সেই মূর্তি তৈরি করেন নবদ্বীপের তন্ত্রসাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ মহাশয়। তাঁর আসল নাম কৃষ্ণচন্দ্র মৈত্র। খ্রিস্টিয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর সন্ধিকাল তখন।

পাঠান শাসনে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে নানা ভাবে বিপর্যস্ত বাংলার হিন্দু সমাজ তখন চৈতন্যদেবের প্রভাবে বৈষ্ণব ধর্মের প্রেম-ভক্তিরসে প্রবলভাবে আপ্লুত। বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হবার তোড় তখন জনমনে। সেই স্রোতের বিপরীতে হেঁটে বাংলার শক্তিপূজাকে প্রায় অবলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাতে কৃষ্ণানন্দ মগ্ন হলেন মা-কালীর সাধনায়। তখন দেবীর নির্দিষ্ট কোনো মূর্তি ছিল না, কালীপূজা হোত পটে ও ঘটে। কথিত আছে— অমাবস্যার এক নিশুতি রাতে ধ্যানে কৃষ্ণানন্দ কালীমূর্তি তৈরির দৈবাদেশ পান। 'বৃহৎতন্ত্রসার' গ্রন্থে কৃষ্ণানন্দ স্বয়ং ঘোর কৃষ্ণাবর্ণা, করালবদনা, ত্রিনয়নী, মুক্তকেশী, ভয়ঙ্করী দিগ্‌বসনা কালীর বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর কুচযুগ স্ফীত, কটিদেশে নরকরের মেখলা, দন্ত পংক্তি বিকশিত,, লোল জিহ্বা, দুই অধর প্রান্তে রক্তধারা, তিনি রক্তচর্চিতা, মুণ্ডমালা শোভিতা চতুর্ভুজা। তাঁর উপরের হাতে খড়্গ, অন্য হাতে সদ্য ছিন্নমুণ্ড, নীচের এক হাতে বর, অন্য হাতে অভয়মুদ্রা। ঈষৎ হাস্যমুখে দেবী শবরূপে শয়ান মহাদেবের বুকে রক্তমাখা দক্ষিণ চরণ রেখে লজ্জার জিভ কেটে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। এই মূর্তি পূজার বিধিও তাঁর তৈরি। মাতৃসাধক কৃষ্ণানন্দ প্রতি অমাবস্যার ভোরে যথারীতি কালীমূর্তি তৈরি, পূজা এবং নিশাবসানে প্রতিমা নিরঞ্জন করতেন। কৃষ্ণানন্দ পূজিতা এই দেবীই বাংলার আদি দক্ষিণাকালী। কৃষ্ণানন্দ রচিত মৃন্ময়ী দক্ষিণা কালী মূর্তি এবং দক্ষিণেশ্বরের স্কন্দমাতার প্রস্তরময়ী রূপের কোনো তফাত নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে আছে। অষ্টাদশ শতকের শুরুতেই সমগ্র গৌড়বঙ্গ জুড়ে দেখা দিয়েছিল অমানিশার অন্ধকার। মোগল সম্রাটদের রাজত্বকালে দেশে মোটামুটি শান্তিশৃঙ্খলা বজায় থাকলেও ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তা হল অন্তর্হিত।

একদিকে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে শোনা যেতে লাগলো ইংরেজ শাসনের পদধ্বনি। বাংলার সমাজ জীবনেও তখন বিপর্যস্ত অবস্থা। চৈতন্যদেবের প্রভাব তখন ক্রম অবলুপ্তির পথে। বৈষ্ণবের প্রেমধর্ম সহজিয়া পন্থা অবলম্বন করে যে তৎকালীন রূপ লাভ করেছিল, সমাজের শিষ্ট সম্প্রদায় তাকে 'নেড়া-নেড়ির কাণ্ড' বলে তা থেকে শতহস্ত দূরে সরে গিয়েছিলেন। বাংলার এই সামগ্রিক অবক্ষয়ের যুগে আলোকবর্তিকা হাতে দেখা দিলেন সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন। শাক্ত সাধনার উচ্চস্তরে আরোহণ করে তিনি রচনা করলেন সাধন সঙ্গীত। এগুলিকে আমরা শাক্তপদাবলী নামে অভিহিত করে থাকি। সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে বিপর্যস্ত বাঙালি মানস রামপ্রসাদের গানে অভিভূত হয়ে শ্যামা মায়ের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করল। পরবর্তীকালে এই ধারার অন্য এক কবি কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের হাতে শাক্ত পদাবলী আরও শিল্পসম্মত রূপ লাভ করল। অবিদ্যা-অপরা-পরা বিশ্বময়ী বিশ্বজননী কবিদের অনেক পদেই স্নেহময়ী গৃহজননীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। রামপ্রসাদ সেন শাক্ত পদাবলীর আদি কবি। তিনি শাক্তগানে এমন ভক্তির জোয়ার আনেন যে, শ্যামা-সঙ্গীতে তাঁর নাম প্রধান হয়ে উঠল। রামপ্রসাদ শ্যামা মায়ের রূপ বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন : ''করালবদনা কালী কলুষ হারিণী সংসার সাগরে ঘোর নিস্তার তারিণী।''

রামপ্রসাদের গানে দেবী হয়ে উঠেছেন 'আদিভূতা সনাতনী' এবং 'শূন্যরূপা শশীভালি', অথচ তিনিই আবার মাতৃরূপে সন্তানের সর্বদুঃখহারিণী এবং শান্তি প্রদান কারিণী— ''নিশি জাগিয়ে, পোহাও জননীর গুণ গেয়ে / কি সুখ চৈতন্য দেহে অচৈতন্য হইয়ে রে। / নিদ্রায় কি আছে ফল মহানিদ্রা নিকট হৈলে, মন! তখনি মনের সাধ- পুরায়ে ঘুমাবে রে।''

এই ভাবে অধ্যাত্ম সাধনা বাস্তবজীবনে এবং কাব্যরসের অপূর্ব সমন্বয়ে রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের গান শ্যামাসঙ্গীত হিসেবে আলাদা মাত্রা পেয়েছে। পরবর্তীকালের কবিরা যেমন— দ্বিজ রামপ্রসাদ, রামদুলাল নন্দী, দাশরথি রায় প্রমুখ শ্যামাসঙ্গীত রচনার ক্ষেত্রে রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের প্রদর্শিত পথেই অগ্রসর হয়েছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণের কালে রামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবে বাংলার মাতৃসাধনা নবরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের কালেও বাঙালি সেই মায়ের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র তো ছিলই তাছাড়াও বাংলার কবিরা সে সময় নানা ভাবে মাতৃসাধনায় মেতে উঠেছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে' গানে বাংলা মায়ের ঐশ্বর্যমণ্ডিত রূপের বর্ণনা করেছেন। এমনকী বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) উপন্যাসে বিমলা চরিত্রের কথা প্রসঙ্গে দেবী কালীর প্রসঙ্গ এনেছেন।

বিদ্রোহী কবি নজরুল তাঁর 'কালো মেয়ের পায়ের তলায়' গানে কালীমায়ের বিশ্বব্যাপী রূপের বর্ণনা দিয়েছেন।

এই ভাবে বাঙালি মাতৃসাধনাকে আঁকড়ে ধরে প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত নানা সংকট থেকে পরিত্রাণের পথ সন্ধান করেছে। আজ বঙ্গসমাজে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারী শক্তির অনবদ্য প্রকাশ ঘটলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষশাসিত সমাজে নারী আজও পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নানাভাবে লাঞ্ছিতা, বঞ্চিতা ও অবহেলিতা। তাঁদের সামাজিক নিরাপত্তাও আজ সংকটাপন্ন। এমতাবস্থায় সময় এসেছে মাতৃপূজার যথার্থ আয়োজন করে নারীশক্তির উন্মেষ ঘটানোর। তবেই বাংলা আবার ভারতের মানচিত্রে গৌরবজনক আসন লাভ করবে।

(সংক্ষেপিত)

(লেখক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক)

এই সময়

উদ্ধারকর্তা

ভূমিকম্পের আতঙ্কে এখনও কাঁপছে মেক্সিকো। ধ্বংসস্তূপে যারা আটকে পড়েছেন তাদের উদ্ধারকাজে প্রশংসনীয়

ভূমিকা পালন করেছে ফ্রিডা। সে মেক্সিকোর নৌবাহিনীর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর। মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে ফিরে আসা বহু মানুষের মুখে এখন তার নাম।

শাড়িবাহক

শ্রীলঙ্কার এক নববিবাহিত দম্পতি সম্প্রতি আড়াইশোজন ছাত্রছাত্রীকে শাড়ি বহন করার

কাজে নিয়োগ করেছিল। সদ্য বিবাহিতা পাত্রীর শাড়িটি লম্বায় এতই বড়ো ছিল যে তা বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিপুল সংখ্যক বাহকের প্রয়োজন হয়।

আমরা-ওরা

আটচল্লিশ নং জাতীয় সড়কের ট্রাফিক জ্যামে আটকে পড়ার কারণে বীরেন্দর কুমার সিংহ

দিল্লি ট্রাফিক কন্ট্রোলে টুইট করলেন, 'ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে আছি। কিছু করুন।' উত্তর এলো, 'আপনি আমাদের সীমার বাইরে চলে গেছেন। আপনার অভিযোগ আমরা গুরুগ্রাম পুলিশকে জানিয়ে দিয়েছি।'

সমাবেশ -সমাচার

বিবেকানন্দ কেন্দ্রের দুর্গাপুর শাখার বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব দিবস পালন

বিবেকানন্দ কেন্দ্র কন্যাকুমারী (পশ্চিমবঙ্গ) দুর্গাপুর নগরে 'বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব দিবস' উপলক্ষে ১ ও ২ সেপ্টেম্বর এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ১ সেপ্টেম্বর বিকেলে দুর্গাপুর নগরের আনন্দালয় শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর মন্দির প্রাঙ্গণে শ্রীমতী সুজাতা নায়েককে সংবর্ধনা জানানো হয়। তিনি বিবেকানন্দ কেন্দ্রের অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তেলেঙ্গানা প্রান্তের সংগঠন সম্পাদিকা। সকলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করানো হয়। ওঙ্কার ধ্বনি, শান্তিপাঠ মন্ত্র, দেশাত্মবোধক গান, আবৃত্তি ও নানাবিধ শ্লোক পাঠ করা হয়। শ্রীমতী নায়েক বাঙালির সংস্কৃতি-সমাজ ব্যবস্থা, দেশ ও সমাজ সেবা-দেশভক্তি-আত্মত্যাগ আত্ম

বলিদান-কঠোর সংগ্রামী জীবনের কথা বলে স্বামীজীর আদর্শে সবাইকে উদ্বুদ্ধ হতে বলেন। আনন্দালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, তাদের মাতা-পিতা, কার্যকর্তা নিয়ে শতাধিক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া পরিবার মিলন, উত্তরপল্লী, বিবেকানন্দ আশ্রমের পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ২ সেপ্টেম্বর বিকালে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব দিবস উদযাপনের জন্য দুর্গাপুর ধাতু ভবনে জনসভা হয়। প্রধান বক্তা সুজাতা নায়েক। প্রধান অতিথি ওভারসিস ব্যাঙ্কের প্রাক্তন ডিজিএম মানিকলাল সাহা। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের প্রান্ত সংগঠক মনোজ কুমার দাস, দুর্গাপুর নগরের সঙ্ঘচালক দেবাশিস লাহিড়ি উপস্থিত ছিলেন।

মালদায় প্রয়াত ঊষা তাই চাটির স্মরণসভা

গত ১৬ সেপ্টেম্বর শনিবার ২০১৭, মালদা শহরের শ্যামাপ্রসাদ ভবনে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির তৃতীয় প্রমুখ সঞ্চালিকা বন্দনীয়া ঊষা তাই চাটির স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, ১৭ আগস্ট বিকেলে তিনি পুণ্যলোকে গমন করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সমিতির অভিভাবিকা শ্রীমতী বন্দনা রায়, মালদা জেলা সঞ্চালিকা শ্রীমতী নীতা সাহা, জেলা কার্যবাহিকা শ্রীমতী তন্দ্রা পাল প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। ভাবগম্ভীর পরিবেশে প্রদীপ প্রজ্বলন ও গীতার শ্লোকের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উত্তরবঙ্গ প্রান্তের বৌদ্ধিক প্রমুখ শ্রীমতী মানসী ভৌমিক কর্মকার তাইজীর মধুর চরিত্র ও কর্মময় জীবন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানের শেষে তাইজীর জীবননির্ভর একটি তথ্যচিত্র প্রজেক্টারের মাধ্যমে দেখানোর ব্যবস্থা হয়। শ্রীমতী নিরুপমা সরকারের শান্তিমন্ত্র পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ড. তুষারকান্তি ঘোষ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিদ্রোহী সরকার, তরুণ কুমার পণ্ডিত, প্রবীর মিত্র প্রমুখ।

এই সময়

অকৃতজ্ঞ

ধমনীতে রক্ত আটকে যাওয়ায় চীনের এক ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।

জটিল অস্ত্রোপচারের পর চিকিৎসকেরা তাকে সুস্থ করে তোলেন। কিন্তু অস্ত্রোপচারের সময় রোগীর জামাকাপড় নোংরা করা হয়েছে— এই অভিযোগ করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন ওই ব্যক্তির বাবা।

বিদ্যুৎ-বাস

বিদ্যুৎ-চালিত বাস! হ্যাঁ, ঠিক শুনেছেন। গোল্ডস্টোন ইনফ্রাটেক লিমিটেড ভারতের প্রথম বিদ্যুৎ-চালিত বাস বাজারে এনেছে। চলবে হিমাচল প্রদেশে। কুলু থেকে মানালি হয়ে রোহ্‌তাং পাস পর্যন্ত যাবে এই বাস।

স্নানযাত্রা

রেললাইনে এক কোমর জল। প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষমাণ যাত্রীরা। দূর থেকে দেখা গেল

ট্রেন আসছে। এল এবং স্নান করিয়ে দিয়ে গেল সবাইকে। ঘটনাটি মুম্বইয়ের নিকটবর্তী নালাসোপাড়া স্টেশনের।

সমাবেশ -সমাচার

শিকাগো ভাষণের ১২৫ বর্ষপূর্তিতে সংস্কার ভারতীর বিবেক স্মরণ

আজ থেকে ১২৫ বছর আগে স্বামীজীর বিশ্বজয়ের বাণীকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে অখিল ভারতীয় সাংস্কৃতিক সংস্থা সংস্কার ভারতী সিউড়ী শাখা নিবেদিত সমবেত নৃত্যার্পণ তেজোনিধি অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো ভাষণের ১২৫ বর্ষ উদযাপন সমিতির আমন্ত্রণে কলকাতা শোভাবাজার রাজবাড়ির নাটমন্দির প্রাঙ্গণে আয়োজিত প্রবুদ্ধ সম্মেলনের সূচনায় পরিবেশিত হয় সমবেত নৃত্যার্পণ তেজোনিধি। স্বামী বিবেকানন্দের আত্মকথা, রচিত কবিতা, প্রিয় গান ও জীবনাদর্শের এক অনবদ্য কোলাজ সমবেত নৃত্যার্পণ তেজোনিধি— A ray of divine command অর্থাৎ দৈব আদেশের বিচ্ছুরণ। সূচনাতে শিববন্দনার মাধ্যমে নৃত্যালেখ্যটির যে সুর বাঁধা হয়, তার রেশ থাকে সমাপ্তি পর্যন্ত। পরবর্তী নিবেদন সূর্য বন্দনার ভিন্নধর্মী কোরিওগ্রাফি যথেষ্ট মনোজ্ঞ ও সাহসী। মন চল নিজ নিকেতনে গানটি বহু শ্রুত অথচ এর আবেদন আজও অমলিন। গানটি আশ্চর্যজনক ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও বিবেকানন্দকে এক সূত্রে গ্রথিত করেছে।

সেই মেজাজটি পূর্ণ মাত্রাতেই পাওয়া গেল নৃত্য নিবেদনের মাধ্যমে। সেই তেজোময় জ্যোতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে স্বামীজীর লেখা বিখ্যাত কবিতা Kali the mother বা মৃত্যুরূপা মাতার উপর নিখুঁত দৃশ্যায়ন দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। স্বামীজীর জীবন প্রবাহকে সফল রূপে দর্শকদের কাছে তুলে ধরতে প্রজেকশনের ব্যবহার অভিনবত্ব এনেছে। স্বামীজীর রচিত ইংরেজি কবিতা চয়ন করে তার ব্যবহার নৃত্যনাট্যটিকে অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে। মঞ্চে ৫১ জন শিল্পীর নৃত্য উপস্থাপন তথা নৃত্য পরিচালনায় মৌমিতা বিষ্ণুর কৃতিত্ব দাবি রাখে। স্বামীজীর শিকাগো ভাষণ সাধারণ ভারতবাসীকেও নিজের দেশকে গভীর ভাবে ভালোবাসতে শিখিয়েছিল। তার রেশ ধরেই দেশ বন্দনার মাধ্যমে নতুন ভারতের সন্ধান দেওয়া হয় অন্তিম পর্বে। যেখানে প্রদীপ-চামরের ব্যবহার অভিনব। সংস্থার সভানেত্রী স্বপ্না চক্রবর্তী বলেন, নতুন প্রজন্মের কাছে পশ্চিম আকাশে পূবের সূর্যোদয়ের ১২৫তম বর্ষে সেই তেজোময় জ্যোতি স্বামী বিবেকানন্দের অমোঘ বার্তা পৌঁছে দেবার লক্ষ্যেই সংস্কার ভারতীর শ্রদ্ধার্ঘ্য তেজোনিধি।

ভারতমাতা পূজা উপলক্ষে আলোচনা সভা

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা থানার অন্তর্গত শিবানীপুর স্বামী বিবেকানন্দ উদ্যানে মহালয়া উপলক্ষে ১৯ সেপ্টেম্বর 'মুক্তকণ্ঠ'-র ব্যবস্থাপনায় ভারতমাতা পূজা, তর্পণ, চণ্ডীপাঠ ও আলোচনা সভা হয়। ভারতমাতা পূজা ও চণ্ডীতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন সাহিত্য গুণরত্ন অমরেশ মুখোপাধ্যায়। দুর্গা গীতি পরিবেশন করেন অনন্ত ভট্টাচার্য ও কৃত্তিকা মণ্ডল। চণ্ডী বন্দনা করেন ডাঃ সরোজ সরদার। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ অবলম্বনে 'ত্বং হি দুর্গা' বিষয়ে

এই সময়

ল্যাব্রাডর

ল্যাব্রাডর জাতের কুকুরটি বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা। পথ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সে

ইতিমধ্যেই প্রবাদে পরিণত। মাথায় হেলমেট না পরে সে বাইকে ওঠে না। উপরন্তু রাস্তায় কাউকে ট্রাফিক আইন ভাঙতে দেখলে তার দিকে তেড়ে যায়।

স্বচ্ছতাই সেবা

'স্বচ্ছতাই সেবা' ক্যাম্পেনে প্রায় এক কোটি মানুষ যোগ দিয়েছেন। চেন্নাইয়ে শহর

'পরিষ্কার এবং সবুজ' রাখার উদ্যোগে মাদ্রাজ হাইকোর্টের মাদুরাই বেঞ্চের একাধিক বিচারক অংশগ্রহণ করেন।

মহামনা এক্সপ্রেস

বহু প্রতীক্ষিত মহামনা এক্সপ্রেসের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই

রাস্তাটি গুজরাটের ভদোদরা থেকে বারাণসী পর্যন্ত গেছে। স্বাগত ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে চাই সার্বিক বিকাশ।

ভাবোদ্দীপক বক্তব্য পেশ করেন আইনজীবী ও সমাজসেবী তপনকান্তি মণ্ডল। তিনি হিন্দু ধর্ম সংস্কৃতি আধ্যাত্মিকতা ও ইতিহাস চেতনার মাধ্যমে বৈভবময় শক্তিশালী ভারত গঠনের আহ্বান জানান। দেশের কাজ— আমাদের কাজ, আজকের আহ্বান বিষয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেন যথাক্রমে মৃগাঙ্ক মণ্ডল, দেবদাস মণ্ডল, দীনবন্ধু মণ্ডল প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কল্লোল নস্কর। সমবেত কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘটে। সবশেষে উপস্থিত ব্যক্তিগণ প্রসাদ গ্রহণ করেন।

ভগিনী নিবেদিতা সার্ধশতবর্ষ উদযাপন সমিতি আয়োজিত মাতৃশক্তির অনুষ্ঠান

ভগিনী নিবেদিতা সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপন সমিতি আয়োজিত অনুষ্ঠান ছিল মূলত মহিলাদের নিয়ে। বিভিন্ন সংগঠনের মহিলাদের উদ্যোগে গঠিত এই সমিতির লক্ষ্য ভগিনী নিবেদিতার ১৫০ বছরে তাঁকে সম্মান জানানো ও কিশোরীদের মধ্যে নারীশক্তির জাগরণে সচেষ্ট হওয়া। এই উপলক্ষে গত ৭ সেপ্টেম্বর কলকাতায় এক মাতৃ সমাবেশের আয়োজন

করা হয়। নারীশক্তির সম্মান ও ভগিনী নিবেদিতা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে মহিলারা মিলিত হয়ে নিঃস্বার্থভাবে একমাস ব্যাপী নানা বালিকা বিদ্যালয়ে গিয়ে রচনা, অঙ্কন ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। কয়েকটি করে বিদ্যালয় নিয়ে আগস্ট মাসে প্রতিযোগিতা করে সেখানে যারা প্রথম হয়েছিল তাদের কলকাতাতে এনে আবার প্রতিযোগিতা করানো হয় সেপ্টেম্বরের সাত তারিখে। তাছাড়া ভগিনী নিবেদিতার ওপর একটি প্রশ্ন-উত্তরের আয়োজন করা হয়েছিল। সায়নী দাশ ও তাহরিনা নাসরিন ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী দুই সাঁতারুকে নিবেদিতা স্মারক সম্মান জানানো হয় রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অব কালচার গোলপার্কে, নারীশক্তির প্রতীক-ভগিনী নিবেদিতা অনুষ্ঠানে। সারাদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে ক্যুইজ ও আবৃত্তির রাজ্যস্তরে প্রতিযোগিতা ও দ্বিতীয় পর্বে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ২০টি জেলার বিভিন্ন বালিকা বিদ্যালয় থেকে ৫৬ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। সকালে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ওই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক স্বামী সুপর্ণানন্দজী মহারাজ। সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ সারদা মঠ, সিরিটি শাখার যুগ্ম সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা নির্ভীকপ্রাণা মাতাজী, বিবেকানন্দ কেন্দ্রের তেলেঙ্গনা প্রান্তের সংগঠক সুজাতা নায়েক, মহিলা কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুনন্দা মুখোপাধ্যায়, নৃত্যশিল্পী অলকা কানুনগো এবং আরও অনেক প্রতিষ্ঠিত ও স্বনামধন্য মহিলা যাদের উপস্থিতি কিশোরীদের উদ্বুদ্ধ করেছে। সম্পূর্ণ মহিলা দ্বারা পরিচালিত এই অনুষ্ঠানে এক হাজারের মতো মহিলা ও বালিকার উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে মাধুর্য মণ্ডিত করেছিল।

ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে রোহিঙ্গা সমস্যা একটি দৃষ্টান্ত হতে পারে

অতিথি কলম

স্বপন দাশগুপ্ত

মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশে গরিষ্ঠাংশ বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে মুসলমান রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এখন বিশ্বমানচিত্রে উঠে আসছে— পাশ্চাত্যপন্থীদের এ বিষয়ে বিপুল ধিক্কার ও ঘৃণা প্রচারের কারণে। আন্তর্জাতিক মিডিয়া প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ পলায়নপর রোহিঙ্গা মুসলমানদের সমস্যাটিকে যথারীতি একটি মানবাধিকার রক্ষার মোড়কে পরিবেশনে তৎপর। এই বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তু প্রতিবেশী বাংলাদেশের সীমানা লঙ্ঘন করে সেখানে অনুপ্রবেশ করায় স্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশ সবরকম চাপের মধ্যে রয়েছে। তারা যে এই বিপুল সমস্যার মোকাবিলা করতে অপারগ তা তারা সারা বিশ্বকে ইতিমধ্যে জানিয়েছে।

ভারতও মায়ানমারের সঙ্গে একটি তুলনামূলক ছোট সীমান্তের মাধ্যমে যুক্ত, তবে তা রাখাইন প্রদেশ নয়। তাই উদ্বাস্তু সমস্যা হয়তো অতটা তীব্র নয়। কিন্তু দেশের অভ্যন্তর ও আন্তর্জাতিক উভয়ক্ষেত্র থেকেই চাপ আছে যাতে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের আগমনের জন্য ভারত তার সীমান্ত খুলে দেয়। এই সূত্রে দিল্লি জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিষয়টি এড়িয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, গৃহমন্ত্রক সূত্রে জানানো হয়েছে গত দশ বছরে যে চল্লিশ হাজার রোহিঙ্গা বেআইনিভাবে ভারতে ঢুকেছে তাদের দেশ থেকে বিতাড়নের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

ভারতের সিদ্ধান্ত যদিও বাস্তবে রূপায়িত করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য তবুও প্রশ্নটি ওঠা মাত্রই মানবাধিকার সংগঠনগুলি রে রে করে উঠেছে। তারা একা নয় নানান মুসলমান সংস্থা, ওজনদার কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব বিশেষ করে যাঁরা এ ব্যাপারে তাঁদের আন্তর্জাতিক সুনাম নিয়ে বরাবর চিন্তিত থাকেন তারাও একযোগে এর বিরোধিতায় নেমে পড়েছেন। এঁদের এমন দরদিও আছেন যাঁরা ইতিমধ্যেই সর্বোচ্চ আদালতে আবেদন করে ফেলেছেন যাতে আদালত কেন্দ্রীয় সরকারের রোহিঙ্গা নীতিকে নস্যাৎ করে দিয়ে যে সমস্ত রোহিঙ্গা ভারতে ঢুকে পড়েছে আর যারা ঢুকতে চাইছে— তাদের পক্ষে রায় দান করেন।

ভারত রোহিঙ্গা সমস্যার ক্ষেত্রে হয়তো কিছুটা নৈতিক দায়িত্ববোধের বিবেক দংশন অনুভব করতে পারে। কিন্তু এই মর্মে বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয়তার প্রাসঙ্গিক প্রশ্নটি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে যা গভীর আলোচনা দাবি করে। প্রথম বিষয়টি অবশ্যই হচ্ছে জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন। ভারত যদি উদ্বাস্তু সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সমঝোতাপত্রের স্বাক্ষরকারী হোত সেক্ষেত্রে অনেকটা নিরুপায়ভাবেই তাকে জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতাকে মান্যতা দিতে কিছুটা আপোশ করতেই হোত। কিন্তু এখানে এ সমস্ত বিষয় কিছুই নেই তাই রোহিঙ্গাদের এদেশে আশ্রয় দেওয়ার প্রশ্নে ভারতের ছিটেফোঁটাও দায়বদ্ধতা নেই। বিশেষ করে তাদের নিজের দেশের অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে ভারতের যখন কোনো ভূমিকাই নেই।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিক থেকেই ভারত মুখ বুজে বিপুল উদ্বাস্তুর বোঝা নিজের কাঁধে নিয়েছে। এছাড়া ১৯৪৮-এ ও ১৯৬০-এ বেশ বড় সংখ্যায় তৎকালীন বর্মা, সিংহল, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের লোকজন ভারতকেই মূল দেশ মনে করে এখানে ফিরে আসে। কিছু কিছু আফগান ও তিব্বতিও বাদ যায়নি। প্রকৃতপক্ষে উদ্বাস্তুদের প্রতি ভারতের আচরণ প্রশংসনীয়। কিন্তু উদ্বাস্তু গ্রহণের ক্ষেত্রে ভারতের উদারতা তার নিজের ঐচ্ছিক, কারোর দ্বারা আরোপিত নয়। দেশে কে ঢুকবে কে বেরোবে তা নির্ধারণের

> “রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু ইস্যুতে ভারতের দৃঢ় জাতীয়তাবাদী অবস্থানটিকে আদালতে টেনে নিয়ে গিয়ে চ্যালেঞ্জ করার অর্থই দেশীয় সাংস্কৃতিক পরিচয়টিকে অস্বীকার করে একটি আন্তর্জাতিক মূল্যবোধের কল্পিত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিশ্র পরিচিতির সৃষ্টি করা।”

ফঃ ৪

অধিকার একান্তই দেশের সার্বভৌমত্বের কথা বিবেচনা করে নির্ধারিত হয়। মনে রাখা দরকার, ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের জন্ম মুহূর্তের গৃহযুদ্ধে যে নির্মম হিংসার বলি হয়ে বহু লক্ষ বিদেশি ভারতে পাকাপাকিভাবে আশ্রয় নিয়েছিল তখন কোনো মানবাধিকার সংগঠন বা আন্তর্জাতিক চক্রের এ বিষয়ে ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টির প্রয়োজন হয়নি।

ভারত তার নীতি নিষ্ঠা ও মানবিকতার প্রশ্নে তা করেছিল। আজকের এই তথাকথিত শুভাকাঙ্ক্ষীরা জন্মেও কখনও পাকিস্তানে বা বাংলাদেশে বসবাসকারী সংখ্যালঘুদের দীর্ঘকালীন দুর্দশার বিষয়ে আন্তর্জাতিক কোনো সংস্থার দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজন মনে করেনি। সকলেরই হয়তো জানা যে তাদের এই ক্ষোভ উদ্‌গীরণ বা ধিক্কার সব সময়ই একটি বাছাই প্রক্রিয়ায় মধ্যে দিয়ে চলে। আজকের রোহিঙ্গা সমস্যাকে কেন্দ্র করে এই গোষ্ঠী ভারতের নিজস্ব সার্বভৌমত্বকেই চ্যালেঞ্জ করার মতলব করছে।

এই ইস্যুতে অর্থাৎ দেশে কে বাঞ্ছিত আর কে অবাঞ্ছিত তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভারত একা নয়, মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পও তাঁর দেশের প্রভাবশালী অংশকে জানিয়েছেন দেশের অভিবাসন নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে জাতীয় প্রয়োজনের সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টি সবিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। ইংল্যান্ড ক্যালে'তে (calais) বসে থাকা হাজার হাজার আফ্রিকানদের নিজের দেশে ঢুকতে দেয়নি। পশ্চিম এশিয়া থেকে উদ্বাস্তু হওয়া একটি ব্যক্তিকেও হাঙ্গেরি তার দেশে ঢুকতে দেয়নি যতই না ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের Sanction-এর রক্তচক্ষু থাক। অতীতে রাশিয়ান উদ্বাস্তুদের ঠেকাতে নরওয়ে তার সীমান্তে বেড়া লাগিয়েছিল। এমন উদাহরণে ইতিহাসের পাতা ভর্তি। তাই রোহিঙ্গাদের অস্বীকার করে ভারত কোনো দানবীয় কাজ করেনি। কেবলমাত্র তার জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে সময়োচিত পদক্ষেপই নিয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টা যখন নিতান্তই নির্বাচিত সরকারের নীতি নির্ধারণ ও একান্তভাবে প্রয়োগের ওপর নির্ভরশীল, সেখানে আদালতে গিয়ে দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে কে অভিপ্রেত আর কে বেআইনি অনুপ্রবেশকারী তা ঠিক করার ভার বিচারককে দেওয়ার চেষ্টা নিতান্তই বিস্ময়কর। অনেকাংশে এই প্রচেষ্টা আদালতের অতি সক্রিয়তাকে প্রশ্রয় দেওয়ার অপপ্রয়াস। ঠিক যেমনটা ইউপিএ-২ এর কার্যকালে দায়িত্ব এড়াতে বার বার করা হয়েছিল। আদালতকে আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা দেওয়া ও একই সঙ্গে আইনের ব্যাখ্যা করার অধিকার দেওয়ার এই প্রবণতা আদৌ কাঙ্ক্ষিত নয়।

একটি দেশের ইতিহাস কখনই তার আইনসভা, আদালত বা সংবিধানের শুরু হওয়ার দিন থেকে শুরু হয় না। এর পেছনে থাকে অনাদি অতীতের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, বহু শতাব্দীর জাতীয় উপলব্ধি যা ইতিহাসে একটি পরম্পরার সৃষ্টি করে। আজকের ভারতে সচেতনভাবে বা অন্য উপায়ে একটা বাতাবরণ সৃষ্টি করার চেষ্টা হচ্ছে যাতে সামাজিক তাৎক্ষণিক পরিচয়টিই বড় হয়ে ওঠে এবং অন্যদিকে চিরন্তন জাতীয়তার সংজ্ঞাটি খাটো হয়ে পড়ে বা একেবারেই হারিয়ে যায়। রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু ইস্যুতে ভারতের দৃঢ় জাতীয়তাবাদী অবস্থানটিকে আদালতে টেনে নিয়ে গিয়ে চ্যালেঞ্জ করার অর্থই দেশীয় সাংস্কৃতিক পরিচয়টিকে অস্বীকার করে একটি আন্তর্জাতিক মূল্যবোধের কল্পিত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিশ্র পরিচিতির সৃষ্টি করা।

একটি জাতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতিকে যথাযথ মর্যাদা না দিয়ে তাকে ভুলিয়ে দেওয়ার মানসিকতাই এখানে ক্রিয়াশীল। মনে রাখতে হবে মূলগতভাবে এই প্রচেষ্টা নিতান্ত অগণতান্ত্রিক— কেননা একটি নির্বাচিত সরকারকে (অর্থাৎ মানুষ যাদের নির্বাচিত করছে যথাযথ সিদ্ধান্ত নিতে) এড়িয়ে তাদের সিদ্ধান্তকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করার মতলবে আদালতের সাহায্য নিয়ে নিজেদের তথাকথিত বৌদ্ধিক আন্তর্জাতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার অপচেষ্টা মাত্র।

অর্থাৎ দেশের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে অমান্য করা। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এর পেছনে রয়েছে সেই সমস্ত মস্তিষ্ক যারা হয় রাজনীতির ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই পরাজিত হয়েছে বা আর রাজনৈতিক লড়াই করার মতো হিম্মত জোটাতে পাচ্ছে না। আদালতের ক্রাচ নিয়ে ভেসে থাকতে চাইছে। তাই রোহিঙ্গা ইস্যু ভারতীয় রাজনৈতিক রণাঙ্গনে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এটাই শেষ নয় ভবিষ্যতে এই সূত্রে আরও সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে যদি না অনড় থাকা যায়। ■

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে

SIP করুন, উন্নতি করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

২০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১৫ পর্যন্ত

SIP-তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন তাদের প্রত্যেকের

ফান্ড ভ্যালু বর্তমানে ১.০১ কোটি টাকা, মোট বিনিয়োগ ৪.৮ লাখ টাকা মাত্র।

মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।

DRS INVESTMENT

Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond

কোলকাতা, হাওড়া • Email : drsinvestment@gmail.com

9830372090

9748978406

চিঠিপত্র

গৈরিকীকরণ

আপনার পত্রিকার মাধ্যমে একটি বিষয়ে আমার মানসিক প্রতিক্রিয়া পাঠক পাঠিকাদের গোচরে আনতে চাই। পশ্চিমবঙ্গে ইদানীং লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে একটি বিশেষ রং-এর বিষয়ে এক ধরনের রাজনৈতিক নেতা এবং এক ধরনের বুদ্ধিজীবী ভীষণভাবে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছেন। তাঁদের মুখে ইদানীং খুব শোনা যাচ্ছে 'গৈরিকীকরণ' 'গেরুয়াশিবির' শব্দ দুটি— অবশ্যই খারাপ অর্থে। ওরা অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে মুখমণ্ডল বিকৃত করে শ্লেষাত্মক, বিদ্রূপাত্মক, ব্যাঙ্গাত্মক ভাবে বলে চলেছেন শিক্ষায়, রাজনীতিতে নাকি 'গৈরিকীকরণ'-এর চেষ্টা হচ্ছে; 'গেরুয়াশিবির'-এর তাণ্ডব বেড়ে চলেছে ইত্যাদি; অর্থাৎ গেরুয়া রঙটির বিশেষণ খারাপ অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে।

রাজনৈতিক চাপান-উতোরের দিকে যাচ্ছি না। সেটা আমার উদ্দেশ্যও নয়। আমার কথা হলো ভাষার অপপ্রয়োগ ও ভাষার সন্ত্রাস নিয়ে। উক্ত শব্দদুটি এসেছে গেরুয়া রং থেকে। হিন্দু দর্শনে এই রঙটি বিশেষ অর্থবহ। এটি সততা ও ত্যাগের প্রতীক। যার জন্য আমাদের দেশের সাধুসন্তরা গেরুয়া বসন পরিধান করেন, অধিকাংশ মঠ ও মন্দিরের রঙ গেরুয়া। আবার ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ, মহারাণা প্রতাপ গেরুয়া নিশান উড্ডীন রেখে বিদেশি মুসলমান আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সারাজীবন যুদ্ধ করে গেছেন; সেই অর্থে গেরুয়া রঙটি ভারতীয় শৌর্যবীর্যেরও প্রতীক। ত্যাগ- সততা-শৌর্যের প্রতীক এই রংটি ভারতের জাতীয় পতাকার সবচেয়ে উপরের অংশে স্থান পেয়েছে। অর্থাৎ গেরুয়া রঙটি নিছক কোনো রঙ নয়। এর সঙ্গে হিন্দু দর্শনের অস্মিতা জড়িয়ে আছে, ভারতের জাতীয় পতাকার সম্মান ও পবিত্রতা জড়িয়ে আছে। কাজেই কেউ যখন খারাপ অর্থে বিদ্রূপ করে 'গৈরিকীকরণ' 'গেরুয়াশিবির' শব্দগুলো উচ্চারণ করেন তখন সাধারণ মানুষের মনে হতে পারে গেরুয়া রঙটি নিশ্চয়ই খারাপ অর্থ বহন করে, বিশেষ করে শিশু ও কিশোর মনে এই রঙটি সম্পর্কে খারাপ ধারণা গড়ে উঠা স্বাভাবিক। একটি মহৎ অর্থবহ শব্দ যখন দুষ্ট ব্যক্তিরা বিকৃত করে তখন তাকে ভাষাসন্ত্রাস ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে? মা সরস্বতীর মুখমণ্ডলে অ্যাসিড ছুড়ে তাঁর সুন্দর পবিত্র মুখমণ্ডলকে বিকৃত করার মতো দুষ্কর্ম বলা যেতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দ নিজেকে ও তাঁর মঠ-মিশনকে গৈরিক করেছেন, স্বামী প্রণবানন্দ নিজেকে ও তাঁর মঠকে গৈরিক করেছেন, শ্রীশঙ্করাচার্য নিজেকে ও তাঁর মঠকে গৈরিক করেছেন। তথাকথিত পণ্ডিত- বুদ্ধিজীবী ও ধান্দাবাজ-রাজনৈতিক নেতাদের জিজ্ঞেস করতে চাই তাঁরা এইসব মহাপুরুষদের গৈরিকীকরণের নিন্দা করেন কিনা, এই গৈরিকীকরণকে ঘেন্না করেন কিনা। জাতীয় পতাকার ঊর্ধ্বাংশের গৈরিকীকরণে তাদের আপত্তি আছে কিনা? ভারতের কমিউনিস্টদের ব্যাপারটা বোধগম্য। জন্মলগ্নে তারা সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাস করতেন (যদিও পরে ক্ষমতার মধুভাণ্ডের লোভে তাদের কথিত 'পার্লামেন্ট- নামক-শুয়োরের-খোঁয়াড়ে' ঢুকে শুয়োরের মতো গুঁতোগুঁতি আরম্ভ করেছেন), তাই রক্তের লালরঙের প্রতি তীব্র আসক্তি আর বিজাতীয় দর্শনের প্রতি নতজানু হওয়ার কারণে ভারতীয় দর্শন, ঐতিহ্যের প্রতি তাদের ঘৃণা-তাচ্ছিল্য থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু অন্যরা? তাঁদের কি সততা, ত্যাগ, শৌর্যবীর্য এইসব গুণাবলী পছন্দ নয়? যদি পছন্দ না হয় সেটা স্পষ্ট করে দেশবাসীকে জানান। 'ঘোমটার-আড়ালে-খ্যামটার-নাচন' করবেন না। মানুষকে বোকা ভাবা এবং বোকা বানানো ত্যাগ করুন। গেরুয়া রঙের বিশেষণকে কলুষিত করে বাংলাভাষার অমর্যাদা করবেন না, আপনাদের এই ভাষাসন্ত্রাস শিক্ষিত মানুষ বেশিদিন বরদাস্ত করবেন না।

আমি রামকৃষ্ণ মিশনের একজন প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী মহারাজদের উদ্দেশ্যে একটি বিনীত নিবেদন করতে চাই— যখন গেরুয়াবসন পরিহিত অবস্থায় আপনারা আমাদের সামনে আসেন তখন ত্যাগ-তিতিক্ষা-সততার-প্রতিমূর্তি আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন এই ভাবনা থেকে আমাদের শির আপনা থেকেই নত হয়। গেরুয়ারঙের প্রতি হিন্দুদর্শনের এই উচ্চ ধারণায় যারা আঘাত করছে তাদের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলবেন না আপনারা? ঠাকুর রামকৃষ্ণও কিন্তু প্রয়োজনে ফোঁস করতে বলেছেন। পবিত্র গৈরিক রঙকে যারা বিকৃত অর্থে ব্যবহার করছে সেইসব দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে ফোঁস করুন। কারণ দুষ্টের দমনও কিন্তু ধর্মের কাজ; দুষ্টের সংখ্যা বেড়ে গেলে ধর্ম ধ্বংস হবে।

—প্রণব দত্ত মজুমদার,
কলকাতা-৪৮।

পাশ-ফেল ফিরছে

পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীতে পাশ-ফেল ফিরছে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই। কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর কলকাতার এক অনুষ্ঠানে তা বলে গিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, লোকসভার বাদল অধিবেশনেই শিক্ষার অধিকার আইনের সংশোধনী আনা হবে। পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীতে পরীক্ষা হবে। তাতে যারা উত্তীর্ণ হতে পারবে না তাদের আর একটা সুযোগ দেওয়া হবে। ফেল করলে সেই ক্লাশেই থেকে যাবে।

তবে পাশ-ফেল ফেরানোর দাবিতে দীর্ঘ কয়েক বছর বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন আন্দোলন করে আসছে। পূর্ববর্তী কংগ্রেস পরিচালিত ইউপিএ সরকারই পাশ-ফেল প্রথা তুলে দিয়ে নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের পরবর্তী শ্রেণীতে

'প্রোমোশন'-এর ব্যবস্থা চালু করেছে। অর্থাৎ, 'নো ডিটেনশন'। পাশ করলেও পাশ, ফেল করলেও পাশ। এক শ্রেণীতে দু'বছর নয়। এ রাজ্যের পূর্বতন বাম সরকার ছিল পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার মূল হোতা। আর কেন্দ্রের কংগ্রেস চালিত সরকারও ছিল এই কুপ্রথার সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক। উদ্দেশ্য রাজনীতি। ছাত্রছাত্রীরা যাতে পড়াশুনা না করেই ক্লাশে ক্লাশে 'প্রোমোশন' পেয়ে যায় তার ব্যবস্থা করা। এ রাজ্যে বাম আমলে, অর্থাৎ ৩৪ বছরে শিক্ষার ঘটেছে সাড়ে সর্বনাশ— বিশেষত স্কুল শিক্ষার। সর্বনাশের প্রথম শুরু প্রাথমিকে। সরকার শুধু পাশ-ফেল তুলেই দেয়নি, তুলে দিয়েছে ইংরেজি শিক্ষাও। যদিও ভারতের ন্যায় একটি বহু ভাষাভাষীর দেশে তথা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ইংরেজির একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে প্রথম ইংরেজির ন্যায় একটি আপাত কঠিন বিষয়ের শিক্ষা শুরু হলে সেই শিক্ষাকে ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে রপ্ত করা কতটা সম্ভব? অতঃপর পাশ-ফেল তুলে দিয়ে সরকার স্কুল শিক্ষা ও ছাত্রছাত্রীদের যে কতটা ক্ষতি করেছে তা ভুক্তভোগীরাই অবহিত। ফলশ্রুতিতে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এ রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের সেই যে পিছিয়ে পড়া শুরু, আজও তা অব্যাহত।

অতঃপর বাম রাজত্বের অবসান এবং তৃণমূল রাজত্বের আগমনে বিগত ছয় বছরেও শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেনি। শিক্ষা যে তিমিরে ছিল, আজও রয়ে গিয়েছে সেই তিমিরে। অথচ একদা সারা ভারতে শিক্ষায় এ রাজ্য ছিল প্রথম স্থানে। আর আজ সেই স্থান নেমে গিয়েছে প্রায় শেষের দিকে। এ সরকারও কেন্দ্রের শিক্ষানীতির করছে বিরোধিতা। শিক্ষানীতির মধ্যেও দেখছে গেরুয়াকরণের চক্রান্ত। তাই পাশ-ফেল ইস্যুতেও কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠতে চলেছে।

—ধীরেন দেবনাথ,
কল্যাণী, নদীয়া।

সহিষ্ণুতা-অসহিষ্ণুতা প্রসঙ্গে গোরক্ষকদের ভূমিকা

অতি সম্প্রতি ভারতবর্ষে 'সহিষ্ণুতা' এবং 'অসহিষ্ণুতা' প্রসঙ্গে গোরক্ষকদের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি সমালোচিত হয়েছে। সংবিধানকৃত 'ধর্মনিরপেক্ষতার' ধুয়ো তুলে ভারতবর্ষের চিরাচরিত প্রাচীন গোসম্পদকে সুরক্ষার পরিবর্তে একটা সাম্প্রদায়িক শক্তির অমানবিক এবং পৈশাচিক প্রথার যুপকাষ্ঠে বলি দেওয়ার পথটা সুগম করে দেওয়া হচ্ছে। ২০১০ সালে বিশ্বমঙ্গল গোগ্রাম যাত্রা সমিতির প্রতিনিধি মণ্ডলীর নেতৃবৃন্দ দিল্লিতে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী প্রতিভা পাতিলের নিকট ৮ কোটি দেশবাসীর হস্তাক্ষর সম্বলিত এক স্মারকলিপি পেশ করেছিলেন। মহামান্যা রাষ্ট্রপতি এই বিষয়ে প্রথা অনুযায়ী গোহত্যা বন্ধের আশ্বাস দিয়েছিলেন। তারপর গঙ্গা দিয়ে বহু জল বয়ে গেছে। এ পর্যন্ত কোনো কার্যকরী ভূমিকার ছিটে ফোঁটা দেখতে পাওয়া যায়নি। গোরু ভারতীয় ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেবল প্রতীক মাত্র নয় কৃষিনির্ভর অর্থনীতি ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। প্রাচীনকাল হতে এই গোসম্পদের ভারতীয় সভ্যতার সমৃদ্ধিতে কার্যকরী ভূমিকা ও উল্লেখযোগ্য অবদানের কথা অস্বীকার করা যায় না।

এই গোধন রক্ষার কাজে সর্বোপরি দুজন মহাপুরুষের নাম স্মরণযোগ্য। প্রথমজন মহাত্মা কর্মযোগী পণ্ডিত রাম চন্দ্র শর্মা (১৯০৯ আগস্ট— ২০০৯ এপ্রিল)। অপরজন ভূদান ও গোদান যজ্ঞের মহামহিম আচার্য বিনোবা ভাবে (১৮৯৫-১৯৮২)। পণ্ডিত রাম চন্দ্র শর্মা মাত্র ১৮ বছর বয়সে গোমাতার নির্মম হত্যায় ব্যথিত হয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ভারতবর্ষে গোহত্যা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত জীবনে কখনো অন্ন ও লবণ গ্রহণ করবেন না। ১৯৩২ সাল হতে ভারতের গোরক্ষা আন্দোলনে তিনি পুরোধা পুরুষ ছিলেন। গোরক্ষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ২৯ বার জেলে গেছেন। ১৯৩২-৪২ পর্যন্ত তাঁর এই আন্দোলনের ফলে ১১০০ মন্দিরে পশুবলি বন্ধ হয়। এক সময় কলকাতার কালিঘাট মন্দিরে পশুবলির প্রতিবাদে ২ বার অনশনে বসেন। ১৯৬৬ সালের শেষের দিকে দিল্লিতে তাঁর নেতৃত্বে বিরাট গোরক্ষা আন্দোলন সংগঠিত হয়। ওই সময় সন্ত রাম চন্দ্র শর্মা দেশ হতে সম্পূর্ণ গোহত্যা বন্ধে ১৩৩ দিন আমরণ অনশন করেছিলেন। সার্বজনিক উদ্দেশ্য পূরণে এই দীর্ঘ অনশন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ছিল। (সূত্র সংগ্রহ— বিশ্বহিন্দু বার্তা ১৫/৫.২০০৯)। গোরক্ষা আন্দোলনের আর এক পুরোধা আচার্য বিনোবা ভাবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নিজেকে নিয়োজিত করেন। ১৯৩২ সালে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে কারারুদ্ধ করেন। জেলের কয়েদিদের মধ্যে ২০০ রাজবন্দি ছিলেন। ওইসব বন্দিদের অনুরোধে গীতার একটি করে অধ্যায় ব্যাখ্যা করে শোনাতেন। এইভাবে ১৮ সপ্তাহে গীতার ১৮টি অধ্যায়ের উপর তিনি প্রবচন দিয়েছিলেন। ওই সব রাজবন্দিদের মধ্যে সুবিখ্যাত পণ্ডিত সানে গুরুজী বিনোবাজীর প্রবচন মরাঠি ভাষায় লিপিবদ্ধ করে রাখেন।

আচার্য বিনোবা ভাবের জীবনে বড় আঘাত এল ১৯৮২-র ভারতে এশিয়া ক্রীড়া উৎসবে। বিদেশি খেলোয়াড়দের জন্য কয়েক হাজার গোহত্যার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে দিল্লিতে আমরণ অনশনে বসলেন। দীর্ঘদিন অনশনের ফলে স্বাস্থ্যের অবনতি হলো। ওই বছর ১৫ নভেম্বর তাঁর জীবনদীপ নিভে গেল। ভারতবর্ষের ভ্রান্তবাদী নেতৃবৃন্দ 'ধর্মনিরপেক্ষ' নামক এক ভ্রান্তশব্দের মোহজালে আবদ্ধ হয়ে এই মনীষীদের কাছ থেকে শিক্ষা নিন। একমাত্র তা হলেই আপনাদের চেতনা ফিরবে।

—বিরূপেশ দাস,
বর্ধমান।

চোরবাগান মিত্র পরিবারের ৩৬৭ বছরের প্রাচীন কালীপুজো

সপ্তর্ষি ঘোষ

উত্তর কলকাতার চোরবাগানের মিত্রবাড়ির কালীপুজো কলকাতার প্রাচীনতম পারিবারিক কালীপুজো। আজ থেকে ৩৬৭ বছর আগে ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে চোরবাগান মিত্র বাড়িতে কালীপুজোর সূচনা। সে সময় দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়নি। কলকাতায় এর থেকে প্রাচীন পারিবারিক কালীপুজো আর আছে বলে জানা যায় না। কনৌজ থেকে যে পাঁচজন কায়স্থ সর্বপ্রথম বাংলাদেশে এসেছিলেন, তাঁদেরই একজন কালিদাস মিত্র। আজকের চোরবাগানের মিত্র পরিবার তাঁরই উত্তরসূরি। কালিদাসের অষ্টাদশ অধস্তন বংশধর রামরাম মিত্র ছিলেন মুর্শিদাবাদ নবাবের দেওয়ান। তখন তাদের নিবাস ছিল হুগলি জেলার কোন্নগর মন্দিরবাটি। এরপর আরও তিনপুরুষ পরে এলেন রামসুন্দর মিত্র। রামসুন্দর মিত্র কোন্নগর মন্দিরবাটি থেকে কলকাতার গোবিন্দপুর মৌজার সখের বাজার অঞ্চলে বিশাল প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ করে বসতি স্থাপন করেন। সেদিনের 'সখের বাজার'ই আজকের 'চোরবাগান'। রামমন্দির সংলগ্ন চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ থেকে মুক্তারামবাবু স্ট্রিটে ঢুকলে ডান দিকে ছয়টি লাল রঙের বিশাল থামওয়ালা মিত্রবাড়ি চোখে পড়বে। যে বাড়ি আজও প্রাচীন ঐতিহ্যকে সগৌরবে বহন করে চলেছে।

৮৪ নম্বর মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের মিত্রবাড়িতে কালীপুজোর শুরু ইংরেজি ১৬৫০ সালে। দিল্লির মসনদে তখন আসীন মুগল সম্রাট শাজাহান। সেই থেকে আজ পর্যন্ত এই পুজো অবিচ্ছিন্নভাবে হয়ে আসছে। এই সুদীর্ঘ সময়ে অনেক আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন, অনেক উত্থান-পতন ঘটেছে। সেই আবর্ত থেকে মিত্র পরিবারও বাদ যায়নি। কিন্তু পুজোয় ছেদ পড়েনি একটি বছরের জন্যও। বাড়ির ছেলেমেয়েরা চিন্তায় মননে আধুনিক হলেও, দেবীর পূজায় খুবই শ্রদ্ধাশীল এবং আন্তরিক।

মিত্র পরিবারের প্রতিমা মুক্তকেশী দক্ষিণাকালী। প্রতিমার গায়ের রঙ ঈষৎ

পরম্পরা

নীলাভ। এই প্রতিমার মধ্যে শ্যামা মায়ের ভয়ঙ্কর রূপের প্রকাশ নেই। দেবী এখানে প্রসন্নবদনা। শতবর্ষ অতিক্রান্ত হওয়ার পর ইংরেজি ১৭৫০ সালে রামসুন্দর মিত্র স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে আঠারো ফুট উচ্চতার কালী প্রতিমার প্রচলন করেন। শোনা যায়, সে সময় প্রতিমার সমান উচ্চতায় নানাবিধ মিষ্ট দ্রব্য নৈবেদ্য হিসাবে দেবীকে নিবেদন করা হতো। সেজন্য মিত্র পরিবারের কালীর পরিচয় ছিল ''মিঠাইকালী'' রূপে। পুজোর পর দরিদ্রনারায়ণ সেবায় সেই মিষ্টি বিতরণ করা হতো। এখন অবশ্য কালীমূর্তি আর আঠারো ফুট নেই, দশ ফুটে পরিণত হয়েছে।

অতীতে বিস্তর ধুমধাম ছিল মিত্রবাড়ির কালীপুজোয়। যাত্রা, তরজা, কবিগান চলতো ক'রাত্রি ধরে। দূর দূরান্ত থেকে লোকে আসতো সেসব শুনতে। এই পুজো উপলক্ষে লর্ড ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংস ও পরে ইংরেজ সরকারের বহু গণ্যমান্য ও উচ্চপদস্থ কর্মচারী আমন্ত্রিত হয়েছেন। এ বিষয়ে পুরনো পত্র-পত্রিকায় উল্লেখ আছে। অতীতের সেই সব জাঁকজমক আজ নীরব ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে।

কালীপুজো অনুষ্ঠিত হয় তিন শরিকের মধ্যে পালা করে। চোরবাগানে ১ নম্বর মিত্র লেন ও ৮৪ নম্বর মুক্তারামবাবু স্ট্রিট— পাশাপাশি দুই শরিকের বাড়ি এবং দক্ষিণ কলকাতার ১৫৮ নম্বর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোডে আর এক শরিকের বাড়ি। যে বছর যে শরিকের বাড়িতে পুজো হয়, পুজোর সংকল্প হয় সেই পালাদারের নামে। মিত্রবাড়ির কালীপুজোয় পশুবলির প্রথা নেই। দেবীকে অন্নভোগ দেওয়া হয় না। তার বদলে দেওয়া হয় লুচি, সুজি, বিভিন্ন রকম ভাজা ও নিরামিশ ব্যঞ্জন। আগের মতো আড়ম্বর না থাকলেও মিত্র পরিবার আজও পুজোয় প্রাচীন ঐতিহ্য ও রীতিনীতি বহন করে চলেছেন। ▮

শক্তিসাধনা

কৃষ্ণ চন্দ্র দে

আনুমানিক পাঁচ হাজার বছর আগে থেকেই দেবী পূজার নিদর্শন আমরা পাই মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার প্রত্নতাত্ত্বিক খননে বা অনুসন্ধানে। বৈদিক যুগেও দেবীর প্রভাবের কথা সর্বজনবিদিত। ব্রহ্ম-বিদুষী বাক বলেছেন আমিই ব্রহ্মময়ী, দেবী ও বিশ্বেশ্বরী। ঋগ্বেদের দেবীসূক্ত, রাত্রিসুক্ত এবং সামবেদের রাত্রিসূক্তে যে আদ্যাশক্তির সন্ধান পাওয়া গেছে, তাই-ই বেদান্তের প্রকৃতিতত্ত্ব বলে স্বীকৃতি পেয়েছে।

শক্তি সাধনার প্রচলন খ্রিঃ ষষ্ঠ শতাব্দী থেকেই বাংলায় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বাংলার শক্তি সাধনার একটা ক্রমবিকাশ আছে। তমসো মা জ্যোতির্গময় এই সুরে কাতর প্রার্থনা করেছেন ভক্তসাধক— 'খুলে দে মা চোখের ঠুলি; 'হেরি মা তোর অভয় পদ'। মাতৃসাধক রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামঠাকুর, শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীসত্যদেব, আত্মারাম, কেন্দুকলাই, শ্রীনরেন্দ্র ব্রহ্মচারী, বামাক্ষেপা, মহারাজ রামকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণানন্দ মৈত্র আগমবাগীশ, ত্র্যম্বক বাবা, শ্রী শ্যামাচরণ লাহিড়ী, পদ্মগন্ধ শ্রী বিশুদ্ধানন্দ (গন্ধবাবা), মহাযোগী শ্রী নিগমানন্দ পরমহংস, রানি রাসমণি স্টেটের ওভারসিয়ার শ্রী নলিনী গুপ্ত, শ্রীশ্রী দুর্গাপুরী মা, তপস্বিনী গৌরীমা, কালিকম্বলি বাবা প্রমুখ সাধকগণ তাঁদের মা-ডাকে মায়ের দেবী প্রতিমার মধ্যে এক চিন্ময়ীরূপী জ্যোতির্লোক উপলব্ধি করেছেন। ''চিৎসমুদ্রের মাঝে গো মা / শক্তিরূপা মুক্ত ফলে।'' —শ্রীশ্রী চণ্ডীকে তাঁরা সর্বালঙ্কারা, সর্বপ্রহরণধারিণী এবং অসুর বিনাশে দেবগণের রক্ষাকর্ত্রী বলেই শুধু ভাবেন না,— ভাবেন তাঁকে মহাশক্তি যোগমায়া, চৈতন্য রূপিণী পরমা প্রকৃতি। এই মহাশক্তি পরম সত্ত্বাশ্রয়ী ক্রিয়াশীলা, সর্বনিয়ন্ত্রণ-কর্ত্রী।

তন্ত্র সাধনার শক্তি প্রাণময়ী। তন্ত্রে শক্তি অনাদি ও অনন্ত। শক্তির ধৃতি-শক্তির ক্রিয়া শিবের আশ্রয়ে। মহাকাল শিব সর্বশক্তিময়ী মহাকালীকে বুকে ধরে ধ্যানমগ্ন।

''আদর করে হৃদে রাখ, আদরিণী শ্যামা মা'কে
মন তুই দেখ, আমি দেখি আর যেন ভাই কেউ না দেখে।''

ঈশ্বরের দ্বৈত সত্তা—পুরুষ ও প্রকৃতি। পুরুষ চেতনা, আর প্রকৃতি পুরুষের সৃজন শক্তি। শক্তির স্পন্দনেই হয় সৃষ্টি। শক্তির দুই প্রকাশ। এক কেন্দ্রগ ও ক্রমঃ প্রসারিত প্রকাশ, দুই কেন্দ্রচ্যুত সঙ্কুচিত প্রকাশ। আর ক্রিয়াশীলা প্রকৃতির দুই প্রকাশ : (১) একটি বিন্দু (Frequency)— শ্বেত বিন্দু স্থির— শিবে হয় স্পন্দনহীন স্থিতি। অপরটি হলো রক্তবিন্দু যা ক্রিয়াশীল। তন্ত্রমতে একেই বলে চেতনার বিকাশ বিন্দু; কারণ শক্তি চিদ্-স্বরূপা চেতনা। এই চেতনাই শক্তির সর্বশেষ স্বচ্ছতম প্রকাশ। অধ্যাপক হোয়াইট্‌হেড শক্তিকে সৃজন শক্তি (Primordial Creativity)। এতেই সবিশেষ চেতনা। শিবত্বের উপলব্ধিই পূর্ণ পুরুষার্থ। শক্তির প্রগতি ও দ্যোতনা এখানে তুচ্ছ। জ্ঞানের প্রকাশও শক্তি। এই প্রকাশ শক্তির মূলে আছে ইচ্ছা (will)। প্রাথমিক জ্ঞান নির্বিশেষ (Indeterminate)। এতেই সবিশেষ (determinate)-এর জীব অন্তর্নিহিত। শক্তি শিবেরই প্রকাশ শক্তি। শক্তির এই অমূর্ত প্রকাশকে প্রখ্যাত দার্শনিক হোয়াইটহেড বলেছেন— সৃজন বেগ। সারদা তিলকে লিখিত আছে— বিন্দুই শিব আর 'বীজ' হলো 'শক্তি' আর 'নাদ' এদের সম্বন্ধের প্রাথমিক স্ফুরণ।

শক্তির বিকাশে শক্তির ঘনত্বের উদ্ভব হয়। চেতনা ক্রমশই স্তব্ধীভূত হয়ে আসে। প্রখ্যাত দার্শনিক অভিনব গুপ্ত তাকে জড়ত্বস্তব্ধ প্রকাশ (Complete equilibrium) বলে আখ্যায়িত করেছেন। পরম শিবে শক্তি নিষ্পন্দ, অনেকটা সাম্যের অবস্থা (Polarisation)। শিব ও শক্তির কোনও ভেদ নেই। ঊর্ধ্ব ও অধঃ এর মিলিত অবস্থা। এটাকে বলে একতত্ত্ব রূপ (a state of integral consciomuess)। এই অবস্থার পরেই আসে জ্যোর্তিজ্ঞান। বিন্দু হলো ঈশ্বর আর নাদ হলো সদাশিব। নাদের কম্পন উপলব্ধি হয়। বিন্দুই হলো মহাবিন্দুতে প্রবেশ করার পথ। ক্রিয়ার প্রাথমিক বিকাশ হয় নাদে। নাদ যত ঘনীভূত হয় ক্রিয়া-সংযোগ ততই স্পষ্ট হয়। ক্রিয়া ঘনীভূত হয়ে চেতনার কেন্দ্র সৃষ্টি করে।

শক্তি সাধনায় শ্রীশ্রী চণ্ডী হলেন মহালক্ষ্মী। তিনি চিতিরূপা ভগবানের পরা-প্রকৃতি, বিষ্ণুমায়া। তিনি নারায়ণী; বৈষ্ণবী শক্তিও তিনি। তিনি শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী শ্রীমদ্ভগবতের যোগমায়া মুপশ্রিতা। এই মহাশক্তি শিবাশ্রয়া। শিব নির্গুণ ব্রহ্ম, আর শক্তি হলেন সগুণ ব্রহ্ম।

এরপরে দশমহাবিদ্যার প্রসঙ্গ স্বাভাবিক ভাবে এসে পড়ে। এই দশমহাবিদ্যা প্রসঙ্গে একটু আলোকপাত করার চেষ্টা করছি।

দশমহাবিদ্যা :

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা।।
বগলা সিদ্ধ বিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মকা।
এতে দশমহাবিদ্যা সিদ্ধ বিদ্যা প্রকীর্তিতা।।

—এই দশমহাবিদ্যা হলো সাধকের সর্বসিদ্ধি বিধাত্রী দেবী। মানুষের সকল কামনার সিদ্ধিদান করেন। কথিত আছে পার্বতীই স্বামী শিবকে মনের দুঃখে ও অভিমানে দশমহাবিদ্যার রূপ দেখিয়েছিলেন।

দশমহাবিদ্যার দ্বিতীয়া তারা মা কালীকার মতোই ব্রহ্মবিদ্যাদায়িনী, দুর্গতিনাশিনী, সর্বৈশ্বর্যদায়িনী। তিনি নিত্য বর্তমান। কথিত আছে নাম উচ্চারণে মানুষের পাপ ধ্বংস হয়। দশমহাবিদ্যার স্মরণ মনন করলে লাভ হয় মোক্ষফল। মহাবিদ্যার মানে হলো মহাজ্ঞান। দশ মহাবিদ্যা অর্থাৎ দশটি জ্ঞানস্বরূপা চিন্ময়ী মূর্তি যা চিন্তন করলে মানুষের ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ফল লাভ হয়। তামাম ভারতবর্ষ মাতৃসাধনার দেশ। ভারতবর্ষকে বলা হয় দেবী তীর্থ। এই দেশেই মহামায়ার সকল শক্তির প্রকাশ ঘটেছে। এই মাতৃমূর্তি মৃন্ময়ী হলেও ভারত-আত্মার সঙ্গে তিনি চিন্ময়ী হয়ে মিশে আছেন। বিশ্বে শক্তি সাধনা বলতে মা কালীর সাধনাকেই বোঝেন সকলে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে শক্তি সাধনার ক্ষেত্রে মহাশক্তিকেই বিভিন্ন ভাবে পূজা করা হয়েছে। জগৎ সংহারকারী মহাকাল তোমার রূপ। মহাসংহারকালে তুমি সকল বিশ্বকে গ্রাস করবে। গ্রাস করার অর্থ হলো— এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মাতৃস্বরূপে গিয়ে অবলুপ্ত হওয়া। মায়ের মাঝেই আমাদের সৃষ্টি, মায়ের মধ্যেই লয়। Mystery of creation– এ জগতের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরা এই সত্যকে স্বীকার করে নিয়েছেন।

শক্তি সাধনার দুটি ক্ষেত্র— মনোজগৎ ও বহির্জগৎ। মনোজগতে সাধনার লক্ষ্য আত্মমুক্তি। বহির্জগতের সাধনার লক্ষ্য জগতের সকলের মুক্তি। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বকে কল্যাণের আলোতে আলোকিত করা। ঊনবিংশ শতকে ও বিংশ শতকের প্রথমার্ধে শক্তি সাধনার সঙ্গে ছিল মুক্তি সংগ্রাম জড়িত। মুরারীপুকুরে যে গুপ্ত-সমিতি ছিল, সেখানে প্রত্যহ শ্রীচণ্ডীপাঠ হোত দেবী কবচের প্রার্থনায়। তাইতো ফাঁসীর মঞ্চে বিপ্লবীরা হাসতে হাসতে আত্মবলিদান দিতে পেরেছিলেন। বিপ্লবীদের স্লোগানই ছিল মন্ত্রের সাধন; কিংবা শরীরপাতন। মহামায়ার চরণে জীবনের পরম বন্দনা বন্দেমাতরম্ উচ্চারণ করেই নিত্যলীলায় তাঁরা প্রবেশ করতেন। বেশ কিছু বুদ্ধিজীবী এখনও বিশ্বাস করেন যে ভারত আসলে ইংরেজ রাজত্বের ফলেই সৃষ্ট জাতি রাষ্ট্রসত্তা। একদম ভুল। আমাদের দেশের শক্তিপীঠগুলিকে বা তাদের অবস্থানগুলোকে মানচিত্রে মার্ক করলে দেখা যাবে কালাতীত কাল থেকে ভারতের সীমা চিহ্নিত করেছে। সমগ্র ভারতবর্ষকে একটা সুস্থ অবয়ব দান করেছে একান্ন শক্তিপীঠ। এই সীমা নির্ণয় শঙ্করাচার্যের মঠ প্রতিষ্ঠার থেকেও অনেক প্রাচীন। অনুমান করতে কষ্ট হয় না, কত অনামা মনীষীর জীবন ব্যাপী প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি শক্তিপীঠের নেটওয়ার্ক। জনজীবনের সঙ্গে গভীর ভাবে সম্পৃক্ত জীবন্ত পরম্পরার অঙ্গ এই একান্ন পীঠের নেটওয়ার্ক যেন ভারতবর্ষের স্নায়ুমণ্ডলী। সেই একান্ন পীঠের তেইশটিই বাংলায়। ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার ভরকেন্দ্র ছিল এই বঙ্গভূমি। এখান থেকেই শক্তিমন্ত্র ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতের সর্বত্র। পৌঁছেছিল হিমালয়ের পশ্চিম প্রান্তে সুদূর কেকয়ভূমিতেও (মরুতীর্থ হিংলাজ)। রামায়ণের কেকয় কৈকেয়ীর পিতৃগৃহ, ভরতের মামাবাড়ি কেকয় আজকের বালুচিস্তান।

মহামায়া রুদ্রাণী। করেছেন মধুকৈটভ বধ, মহিষাসুর বধ, শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ, চণ্ড-মুণ্ড বধ। মায়ের শূল হলো আত্মজ্ঞান। তাই দিয়ে অহং বা আমিত্ব যেমন নাশ করেছেন তেমনি সব রিপুও নাশ করেছেন। রিপুজয়ের যুদ্ধ যেমন কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গণে বর্ণিত তেমনি শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও অসুর বিজয়ে পাওয়া যায়। ধূম্রলোচন হুঙ্কারেই ভস্মীভূত; অবিদ্যা বিদ্যার সামনে এমনি ভাবেই বিনাশ পায়। চণ্ডমুণ্ড এলে মায়ের মুখ কালিবর্ণ হয়ে ললাট থেকে করাল বদনা কালিকার আবির্ভাব। তিনিই আজ্ঞাচক্রের জগদভাব বিলুপ্তি। দ্বৈত-প্রতীতি হলো দৈত্য। সেই অসংখ্য দৈত্য নাশ করলেন মহামায়া। যে আটটি অসুর সম্প্রদায় দেবী নিধন করলেন, এরা হলো আমাদের অষ্ট নাগপাশের বন্ধন। এদের নিধন করলেই মুক্তি হয়। জীব শিবত্ব প্রাপ্ত হন। আমিত্ব রূপ রক্তবীজ সাধনপথের বিঘ্ন স্বরূপ। শূল অর্থাৎ আত্মজ্ঞান দিয়ে তাকে বিদ্ধ করলেন মহামায়া। আমিত্ব যাতে আবার আসতে না পারে সেজন্য সব রক্ত পান করলেন দেবী কালিকা। মমতাময় অভিমান দেবী খড়্গাঘাতে বিনষ্ট করলেন নিশুম্ভ বধে। অস্মিতা একা সহায়হীন; শুম্ভ দেবীর শূল রূপী আত্মজ্ঞানে বিলুপ্ত হলো। এইভাবে মহামায়ার করুণায় সব শত্রু ধ্বংস হলেই সাধক আনন্দলোকে থাকেন।

''সম্মোহিতং দেবী সমস্তমেতৎ; ত্বং বৈ প্রসন্না ভূবি মুক্তিহেতুঃ।।"

''দেবী প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ/ প্রসীদ মাতর্জগতোহখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরী পাহি বিশ্বম/ত্বমীশ্বরী দেবী চরাচরস্য।।"

শ্রশ্রীচণ্ডীর যৌগিক ব্যাখ্যা করেছেন শ্রী চিদানন্দ স্বামী তার অমূল্য গ্রন্থ— God as Mother-এ। শ্রীরজনী মোহন বঙ্গানুবাদ করেছেন।

পল্লী লোককবি রাজেন্দ্রনাথ সরকার শক্তি সাধনা অর্থাৎ শক্তি পূজার যে সরল বর্ণনায় সকলের মন জয় করেছিলেন তা আমার মনের মণিকোঠায় চির আসনলাভ করে আছে। ভক্ত কবির আকুতি দেখে আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছি। শাস্ত্রীয় যুক্তিজালকে সরিয়ে রেখে উদাসী বাউল উদাস কণ্ঠে গেয়ে ফিরেছেন আসর থেকে আসরে। তার একটা নমুনা দিতে লোভ সামলাতে পারছি না—

দেখি বর্ণে বর্ণে স্বর্ণে পর্ণে মায়ের কত পূজা হয়।
আমরা ফলকামী সব পূজারী; বুঝে পাইনা কি করি,
হেরি অসিদ্ধ সব পূজা বিশ্বময়।।

(লেখক আইনজীবী)

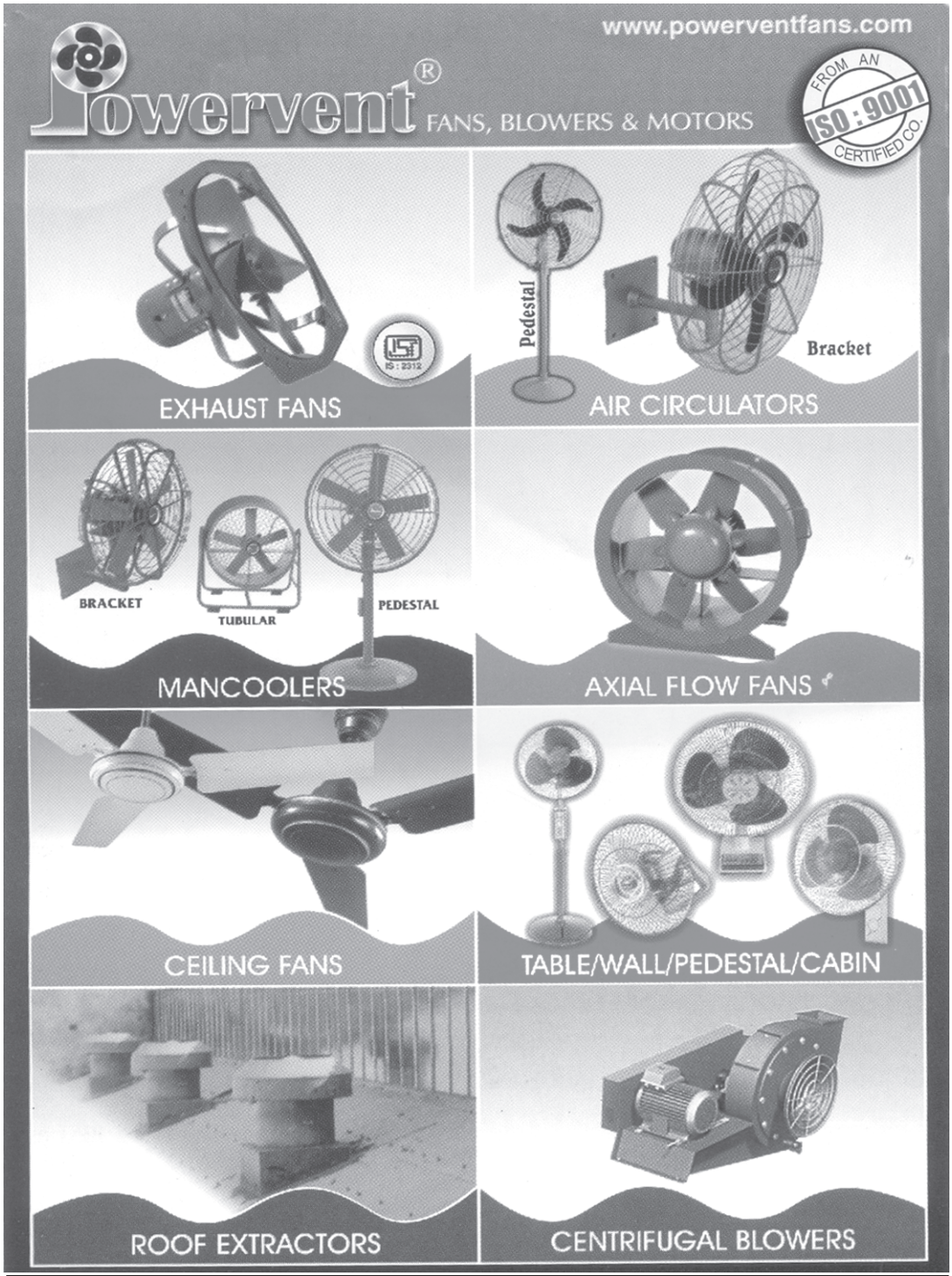

SHREE NURSING TIMBER & ELECTRIC STORES

PODDAR COURT

18, RABINDRA SARANI, GATE NO. 4, 2ND FLOOR, ROOM NO. 7 & 8, KOLKATA - 700 001

PHONE : 2235-5210, 2235-2109, FAX : 91-33-2225-3373

e-mail : sntescal@yahoo.com, SMART - 2386

বাংলাদেশে বন্যাত্রাণেও বৈষম্য : বানভাসি হিন্দুর আর্তি, হামাক খাওন দ্যাও

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি ॥ দিনাজপুর শহরের কালীতলা থেকে চৌরঙ্গী যাওয়ার রাস্তা-সহ পুরো এলাকা জলের নীচে তলিয়ে যাওয়ার পর সেখানকার হিন্দুরা আশ্রয় নিয়েছিলেন শ্মশানকালী মন্দিরে। আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে মন্দিরে গিয়ে অভিযোগ পাই, হিন্দু হওয়ার কারণে এবং কালীমন্দিরে আশ্রয় নেওয়ার অপরাধে তাদের কপালে ত্রাণ জোটেনি। চৌরঙ্গীতে প্রায় চারশো হিন্দুর বাস। সবাই আশ্রয় নিয়েছেন মন্দিরের বারান্দা ও নাটমন্দিরে। এই বানভাসি হিন্দুরা বলেন, স্থানীয়ভাবে কিছু চিড়া-গুড় পাওয়া গেলেও সরকারি-বেসরকারিভাবে তাদের কোনো ত্রাণ সহায়তা দেওয়া হয়নি। চৌরঙ্গীর বাসিন্দা পল্লব চক্রবর্তী বলেন, বাড়িঘর জলের নীচে, বাধ্য হয়ে পরিবারের সবাইকে নিয়ে এই মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছি।

দেবাশিস দাস বলেন, বলতে গেলে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছি। মহিলা ও শিশুরা অসুস্থ হয়ে পড়ছে। দিনাজপুর সদরের পাশে জলমগ্ন একটি ফসলের ক্ষেতের পাশে পাওয়া গেল উত্তর গোবিন্দপুরের চাষি বিপ্লবের স্ত্রীকে। বন্যায় কী কী ক্ষতি হয়েছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'ভগমান ক্ষেপি গেইছে। তামাং রোপা ডুবি গেইছে, একটা ধানও পামো নাই। এরপর যে কী খামো ভগমান জানে।' কেন, সরকারের রিলিফ পাননি, এই প্রশ্নের জবাবে তিনি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জানান, 'ইলিপ আইসে নাই। ভগমান ক্ষেপি গিয়ে এইরকম করছো'।

সরকারি প্রচারে বলা হচ্ছে, প্রচুর ত্রাণ সহায়তা পাঠানো হয়েছে। কেউ ত্রাণ থেকে বঞ্চিত হবে না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বন্যাদুর্গত এলাকা পরিদর্শন করে বলেছেন, আমরা বানভাসি মানুষের পাশে আছি। কেউ ত্রাণ সহায়তা থেকে বঞ্চিত হবে না। জল নেমে যাওয়ার পরও আমরা সহায়তা করে যাবো। কিন্তু দুর্গত এলাকায় গিয়ে পাওয়া যাচ্ছে ভিন্ন চিত্র, বাংলাদেশে সাম্প্রতিক বন্যায় ত্রাণ বন্টনের ক্ষেত্রেও ধর্মীয় বৈষম্যের চিত্রটি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম, লালমণিরহাট, নওগাঁ এবং গাইবান্ধা ঘুরে একই চিত্র পাওয়া গেছে। অভিযোগ পেয়েছি, অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের তুলনায় সংখ্যালঘু বানভাসি মানুষ ত্রাণের ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন।

চৌরঙ্গী পাড়ার গৃহবধূ বধূয়া পাল বলেন, জলের যে অবস্থা, কখন যে ঘরে ফিরতে

পারবো জানি না। জীবন দাস বলেন, বন্যায় আমার ঘরের সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। শুধু টেলিভিশনটা রক্ষা করতে পেরেছি। শূন্য হাতে এসে এই মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছি। হারু কুণ্ডু বলেন, জল সরে যাওয়ার পর ভিটে খুঁজে বের করাটাই হবে কঠিন কাজ। কিছুই অবশিষ্ট নাই। কালী মন্দিরে আশ্রিতদের দীর্ঘশ্বাস বলছে, পুরো চৌরঙ্গী পাড়ার মোটামুটি সচ্ছল জীবনযাত্রাটা উল্টোপাল্টা হয়ে গেল। এর পরও যদি বৈষম্য চলে আমরা ভেসে যাবো।

দিনাজপুর শহর থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে কাহারোল উপজেলার ঐতিহাসিক কান্তজীউর মন্দিরে গিয়ে দেখা গেল, সেখানে ২০টির মতো হিন্দু পরিবার আশ্রয় নিয়েছে। এখানকার চিত্রও একই। দুলালী দাস নামে এক বধূ বলেন, 'হামাক কেউ কিছু দ্যায়নি। বন্যায় ডুবি আছে বাড়িঘর, কেউ সহযোগিতা করতাছে না। মন্দিরের প্রসাদ খেয়ে বাঁচি আছি।' কুমুদিনী দাস বলেন, 'হামরাও কষ্টত আছি। চুলা নাই, আন্দিও খাইতে পারি না।'

কুড়িগ্রাম, নওগাঁ ও লালমণিরহাটে গিয়েও একই চিত্র দেখা গেল। কুড়িগ্রামের সদর উপজেলার ব্রহ্মপুত্র নদের তীরের মাঝির গাঁওয়ের কাঞ্চন বালা উঠেছেন চান্দেরখানম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আশ্রয় কেন্দ্রে। তিনি ব্রহ্মপুত্রের ধ্বংসলীলা বর্ণনা করে বলেন, ভোরে ঘুম ভাঙতেই দেহি মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু গিলে খেয়েছে ব্রহ্মপুত্র। এরপর আশ্রয় কেন্দ্রে উঠিছি। তার পাশেই ছিলেন, লিলি নমশূদ্র। দুজনেই জানান, আটদিন ধরে তারা এখানে আছেন। 'বাহে হামরা এলাও ইলিপ পাই নাই বাহে। বাঁচান মোদের।' এই আশ্রয় কেন্দ্রে জেলে সম্প্রদায়ের ৪০টি পরিবার আশ্রয় নেয়। সদর উপজেলার যাত্রাপুর বাজারে ব্রহ্মপুত্র তীরে দাঁড়িয়ে দেখা যায়, বন্যা দুর্গত এলাকাগুলোতে চলছে খাবারের জন্যে হাহাকার। নৌকা দেখলেই ছুটে আসছে বানভাসি মানুষ। প্রশাসন থেকে ত্রাণ পাঠানোর কথা ঘোষণা করা হলেও এরা কিছু পায়নি।

কুড়িগ্রামের চিলমারি উপজেলার খরখরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেতেই প্রায় ২০/২৫ জন বানভাসি মানুষ ছুটে আসেন, 'হামাক খাওন দ্যাও'। এদের সবাই হিন্দু সমাজের। তাদের বাড়ি বিভিন্ন চরে। বানের জলে বাড়িঘর ভেসে যাওয়ার পর এই আশ্রয় কেন্দ্রে এসে উঠেছেন। কিন্তু জীবন বাঁচলেও খাবার পাচ্ছেন না। তাদের সবারই অভিযোগ, হিন্দু হওয়ার কারণে তারা ত্রাণ পাননি।

লালমণিরহাটের হাতিবান্ধা উপজেলার দক্ষিণ সিন্দুর্না ইউনিয়নের ক্ষত্রিয়পাড়ায় গিয়েও একই অভিযোগ পাওয়া গেল। মুসলমান দুর্গতরা ত্রাণ পেলেও হিন্দুরা পাচ্ছেন না। এ নিয়ে কর্তাব্যক্তিদের কারো মাথাব্যথাও নেই। লালমণিরহাট সদর উপজেলার মোগলহাট ইউনিয়নের বনগ্রামেও একই অবস্থা। যেন হিন্দু সমাজের মানুষ যেখানে রয়েছেন সেখানেই ত্রাণ দিতে আপত্তি।

নওগাঁর রানিনগর উপজেলার ঘোষগ্রাম, নান্দাইবাড়ি গ্রামে হিন্দু দুর্গতরা ত্রাণ পাননি। অথচ আশেপাশে সব এলাকার দুর্গতদের জন্য সরকারি ত্রাণ সহায়তা এসেছে। এসেছে বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার সাহায্য। কিন্তু ছিঁটেফোঁটাও জোটেনি হিন্দুদের ভাগ্যে। গাইবান্ধার কয়েকটি দুর্গত এলাকায় গিয়ে একই অভিযোগ শুনতে হলো। এই সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের কাছে তারা অসহায়, দুষছেন ভাগ্যকে।

ফঃ ৫

(১০ পাতার পর)

হয়েছে, এবার এগুলির ফলাফল সাধারণ মানুষকে অবগত করতে হবে। শিক্ষকদের ভালোভাবে জীবনধারণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। আমি আবারও আশার সঙ্গে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছি যে বহু প্রতীক্ষিত শিক্ষানীতি, যা মূলগতভাবেই পরিবর্তন করতে সক্ষম হবে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে তা অতি দ্রুত আমাদের দেশে উপস্থিত হবে।

তবুও একমাত্র বিদ্যালয়েই কি আমাদের শিক্ষার পদ্ধতি সম্পন্ন হবে? আমরা কি আমাদের সততা ও স্বচ্ছতার শিক্ষা, অপরের দুঃখে সহানুভূতিসম্পন্ন ও কাতর হওয়ার মানবিকতাবোধ সম্পন্ন শিক্ষা লাভ করব না পরিবারের সদস্য, বাবা-মা, অন্য বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ কিংবা প্রতিবেশীদের থেকে? আমাদের মনন ও চিন্তন প্রক্রিয়া কি উৎসব-পার্বণ এবং অন্যান্য কর্মসূচি যেমন— আন্দোলন বা সামাজিক উদ্যোগের দ্বারা পরিপূর্ণতা লাভ করবে না? আমাদের দেশের সংবাদ-মাধ্যমগুলি, বিশেষ করে ইন্টারনেট-মাধ্যম কি আমাদের ভাবনা ও কার্যক্ষমতাকে প্রভাবিত করছে না? ব্লু হোয়েল গেম হলো এর মোক্ষম উদাহরণ। এই দুষ্ট চক্র থেকে আমাদের নির্দোষ ও নিরপরাধ শিশুদের রক্ষা করতে পরিবার, সমাজ ও সরকারের উচিত কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

সাম্প্রতিক কিছু খুব ছোট কারণে ঘটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে পথে নামা; সংবিধান, আইন ও কর্তব্যকে অসম্মান ও অসহিষ্ণুতা দেখিয়ে হিংসাকে আশ্রয় করা, এই পরিস্থিতির সুযোগ নিচ্ছে কিছু সমাজ- বিরোধী অপরাধী ও দেশদ্রোহী যারা আমাদের সমাজের বিশ্বাস, সংহতি ও শান্তি নষ্ট করতে চায়। এগুলি সবই নৈতিক মূল্যবোধের অধঃপতনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। সমাজের প্রতি দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতা, সমাজের একটি অংশের অবক্ষয় ও স্বার্থসর্বস্ব রাজনীতিও রয়েছে এর পেছনে।

নতুন প্রজন্ম পরিবার ও সমাজ থেকেই সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক ব্যবহার সম্বন্ধে জানবে। উস্কানি, অসাম্য ও সহানুভূতি হীনতার দুষ্টচক্রের কারণে স্বার্থসর্বস্ব রাজনীতি সমাজে বিভেদ, অশান্তি ও সংঘর্ষের বাতাবরণ সৃষ্টি করতে চাইবেই। 'সমরসতা'র অনুপস্থিতির এটাই প্রত্যক্ষ ফল। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে বহু সংগঠন ও ব্যক্তি বিচার, সহানুভূতিসম্পন্নতা ও সমরসতার পরিবেশ নির্মাণের লক্ষ্যে তাদের স্বার্থহীন সংযোগ ও সেবার মাধ্যমে অক্লান্তভাবে কাজ করে চলেছেন। যদিও কাঙ্ক্ষিত ফল পেতে গেলে গোটা সমাজকেই দুষ্টচক্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে এবং এব্যাপারে আমাদের নিজেদের কাছেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে এবং জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে এই নীতি কার্যকর করার ব্যাপারে সক্রিয় হতে হবে।

সাম্প্রতিক কিছু বছরে সামাজিক প্রহসন ও পরিবার প্রথার বিভাজন মূলক কয়েকটি নমুনা দেখা গিয়েছে। এগুলি আমাদের পরিবার ও সমাজের নৈতিক মূল্যবোধের অধঃপতনের চিহ্ন। সুতরাং পারিবারিক ও সামাজিক স্তরে নৈতিক জাগরণের লক্ষ্যে আমাদের সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। আমাদের প্রত্যেকের উচিত নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক আচরণ খতিয়ে দেখা ও প্রয়োজনে তা সংশোধন করা। এক স্বাধীন ও উচ্চাভিলাষী রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের সামাজিক জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে জাতীয় আবেগ প্রতিফলিত হওয়া উচিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন :

'সমাজ হলো পরিবারের শক্তি। সামাজিক জীবনের পেছনে রয়েছে পারিবারিক জীবন এবং সামাজিক জীবন দাঁড়িয়ে রয়েছে জাতীয়তার উপর।

এটাই হলো মানব-সংযুক্তির মূল সূত্র। এই চারটি অতি প্রয়োজনীয় ও আবশ্যক উপাদানের প্রত্যেকটিই আমাদের সনাতন ধর্মে রয়েছে। কিন্তু আমরা এই চেতনাগুলিকে নিদ্রিত করে রেখেছি। আজ আবার আমাদের নিজেদের সম্পদের মূল্য উপলব্ধি করার সময় এসেছে।"

সুতরাং বর্তমান পরিস্থিতিতে সমাজের অনেক বেশি সংখ্যায় সংগঠিত হওয়া ও শৃঙ্খলাপরায়ণতার দিকে এগোনোর প্রয়োজন। সেইসঙ্গে সরকারের ভারতীয় মূল্যবোধ-কেন্দ্রিক নীতি এবং প্রশাসনের সেই নীতিকে কার্যকর করার জন্য সৎ, স্বচ্ছ ও বিরামহীন প্রচেষ্টার দরকার। শাশ্বত ভারত আবার নিজেই তার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবে নয়া প্রজন্মের চাহিদাতেই। বিভিন্ন ক্ষেত্রের সমস্ত সজ্জন মানুষ এই প্রয়াসকে স্বাগত জানাতে তৈরি। এখন সামাজিক প্রস্তুতিই হলো সময়ের দাবি।

১৯২৫ সাল থেকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। যখন এই প্রতিষ্ঠানের ৯৩ বর্ষের সূত্রপাত হতে চলেছে, সঙ্ঘ চেষ্টা করছে দেশ জুড়ে কার্যকর্তাদের একত্রিত করার, যাঁদের আমাদের রাষ্ট্র সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা রয়েছে, যাঁরা যথেষ্ট হিম্মত রাখেন এই ধারণাটি সুস্পষ্টতার সঙ্গে প্রচার করবার, যাঁরা তাঁদের এই পবিত্র ও স্বতন্ত্র মাতৃভূমির জন্য উৎসর্গীকৃত-প্রাণ ও একই ভাবে নিজেদের পরিবারের প্রতিটি সদস্যের ব্যাপারেও আবেগপ্রবণ ও কর্তব্যপরায়ণ; যাঁদের হৃদয়ে আমাদের পূর্বপুরুষদের উদ্দীপনা ও স্বার্থত্যাগের বিষয়টি সদা-জাগরুক এবং দেশকে তার পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে দিতে যাঁরা নিজেদের কর্ম ও উদ্যম থেকেই প্রেরণা লাভ করেন। এই কাজ ক্রমাগত বেড়ে চলছে। জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বয়ংসেবকরা সক্রিয় এবং নিজেদের উপস্থিতির মধ্যে দিয়ে তাঁরা সমাজকে সংস্কারিত করছে। স্বয়ংসেবকরা লক্ষাধিক সহযোগী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত, সত্তর হাজার প্রকল্পে তাঁদের অংশগ্রহণ রয়েছে এবং সমাজের অবদমিত অংশকে মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে তাঁরা উদ্যোগী। এই ধরনের প্রচেষ্টার ফলে যে সংগঠিত ও সাধু সমাজের সম্পূর্ণ ছবি ফুটে ওঠে তা হ্রাস পায় বিভাজন, ব্যক্তিগত অহমিকা-কেন্দ্রিক আচরণ, আদর্শহীনতা, আত্ম-অবমাননা ইত্যাদির ফলে। উপরোক্ত উদ্যোগই হলো সমাজকে সুসংহত ও সংগঠিত করার একক ও অদ্বিতীয় পথ। এই প্রক্রিয়ায় আপনাদের সকলের যোগদান প্রয়োজনীয়। মানবিক সত্তা, যথাযথ প্রয়োগ ও সজ্জন শক্তির সহযোগিতার ওপর ভিত্তি করে সঠিক নীতির প্রণয়ন হয়। সংগঠিত, শিল্প ভাবনা সমৃদ্ধ ও সুসংহত সামাজিক আচরণ-বিধির ওপর নির্ভর করে চতুর্গুণ জোটবদ্ধ হওয়া যায় যা আগামীদিনে ভারতবর্ষের অভিব্যক্তিকে বিশ্বগুরু রূপে মূর্ত করবে। এই অনুকূল পরিবেশের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সর্বত্র। অতি সত্বর এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা আমাদের কর্তব্য। ■

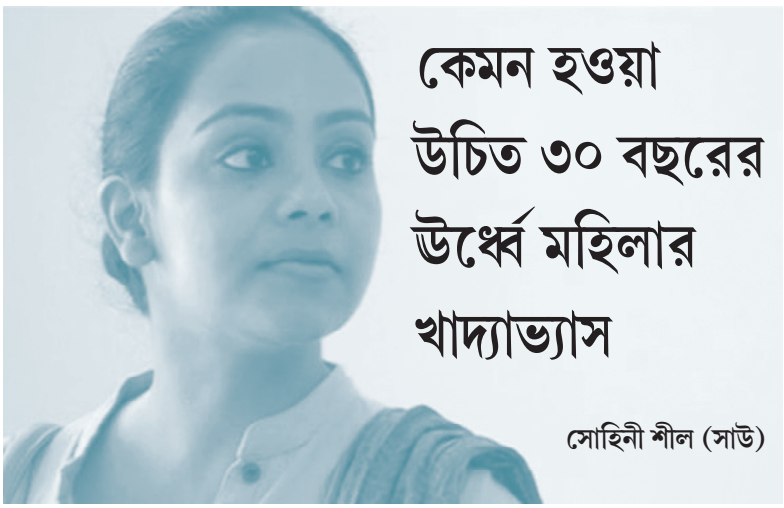

কেমন হওয়া উচিত ৩০ বছরের ঊর্ধ্বে মহিলার খাদ্যাভ্যাস

সোহিনী শীল (সাউ)

মেয়েরা নাকি কুড়িতেই বুড়ি! তাহলে তিরিশ? সেটা তো নিশ্চয়ই আরও বুড়ি! তবে এই কথাটা মাথা থেকে একেবারে সরিয়ে ফেলুন। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে তিরিশ খুব একটা বেশি বয়স নয়। তবে এই সময়টা জীবনের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়। কেরিয়ার, সংসার এবং দাম্পত্য— সব মিলিয়েই এই বয়স যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তিরিশের পর থেকে মহিলাদের শরীর, স্বাস্থ্য এবং মনে অনেক পরিবর্তন আসতে শুরু করে। নানান দিকে নাজেহাল হয়ে স্ট্রেস বেড়ে যায়, এনার্জি কমতে থাকে। তিরিশের পরে তাই ওজন কমানোটাই শুধু একমাত্র লক্ষ্য নয়। মানসিক শান্তি বজায় রাখা ও স্ট্রেস-টেনশন দূরে সরিয়ে রাখাও খুব জরুরি। সঠিক এক্সারসাইজ আর খাওয়াদাওয়ার মাধ্যমেই সেটা সম্ভব। এই সময় মহিলারা জীবনের একটি বিশেষ পর্যায়ে পৌঁছান। অনেক মহিলাই এই সময় নিজের যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে বিশেষ তাগিদ দেখান না। তবে এটা কিন্তু ঠিক নয়। তিনি যদি কর্মরতা মহিলা হন তবে এই সময় তিনি তাঁর কার্যক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন অথবা তিনি যদি একজন মা হন তবে এই সময় তার সর্বপ্রথম গুরুত্ব তার সন্তানই পায়।

এই বিশেষ সময়ে মহিলাদের শরীরে ক্যালশিয়াম এবং ফোলিক অ্যাসিডের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। শস্যদানা বা সিরিয়ালস-এর পরিমাণও এই সময় খুব বেশি না হয়ে মাঝারি থাকা উচিত। যেমন ধরা যাক দু' পিস পাউরুটি, ৫০ গ্রাম চালের ভাত, এক মাঝারি বাটি মুড়ি, দু'টি বা তিনটি পাতলা হাতে গড়া রুটি। এছাড়া স্বাদ বদলের জন্য চিড়ের পোলাও, সুজির উপমাও খাওয়া যেতে পারে।

ডাল বা ডালের বিভিন্ন পদ এই সময় দৈনিক আহারের মধ্যে থাকা অনিবার্য। পাশাপাশি সেদ্ধ ছোলা, মুগ অথবা মটর খাদ্য তালিকায় রাখতে হবে। বিভিন্ন ধরনের সবজি এবং একটি মাঝারি মাপের ফল প্রতিদিন খাদ্য তালিকায় রাখা দরকার।

সবশেষে খাদ্য তালিকায় রাখার প্রয়োজন আছে মাছ (১০০ গ্রাম) অথবা চিকেন। দুটি মাঝারি মাপের চিকেনের টুকরো এবং একটি করে কুসুম-সহ ডিম। এই সময় শরীরের মেটাবলিজম রেট অনেক কম থাকে তাই ওজন বাড়ার প্রবণতা এই সময় অত্যধিক হয়। তাই দৈনিক খাদ্য তালিকায় ঘি, মাখন কিংবা বেশি তৈলাক্ত খাবার না রাখাই ভাল। তার পরিবর্তে দুগ্ধ জাতীয় খাবার রাখতে পারেন। মহিলা যদি কর্মরতা হন তবে তাঁর খাদ্য তালিকায় উপরিউক্ত খাদ্য ছাড়াও খাদ্য গ্রহণের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান সম্পর্কে তাঁকে সচেতন হতে হবে। শুধু তাই নয়, এই বয়সে অনেক কর্মরতা মহিলাই মা হয়ে যান। তাদের ক্ষেত্রে দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় বাদাম, কলা থাকা আবশ্যিক। ■

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না। টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫, হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name : United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

ব্লাটারের ভারত দর্শন ও যুব বিশ্বকাপ

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঠিক দশ বছর আগের এক গ্রীষ্মে ফিফার তৎকালীন অধ্যক্ষ সেপ ব্লাটার ভারতভ্রমণে এসে বলে গেছিলেন দেশটা হচ্ছে ফুটবলের ঘুমন্ত দৈত্য। ঠিকমতো সর্বত্র পরিকাঠামো গড়ে তৃণমূল স্তর থেকে প্রতিভা অন্বেষণ করে পরিচর্যা করলে একদিন ভারত বিশ্বকাপে অবশ্যই খেলবে। আর এদেশে ফুটবলের যা জনপ্রিয়তা ও ফুটবল নিয়ে জনমানসে যে পরিমাণ আবেগ, উদ্দীপনা খেলা করে তাতে একবার অন্তত বিশ্বকাপ তা যে কোনো স্তরেই হোক না কেন, হওয়া উচিত। একবার বিশ্বকাপ আয়োজন করতে পারলে সেই ঘুমন্ত দৈত্য জেগে উঠবে এবং সাংগঠনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার পাশাপাশি খেলার মানও অনেক বেড়ে যাবে বয়স ভিত্তিক বিভাগ থেকে সিনিয়র স্তর পর্যন্ত। তারপর ভারতীয় ফুটবল আপন মহিমায় আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজের সদর্প উপস্থিতির জানান দেবে। কী আশ্চর্য, তখনও ঠিক হয়নি যে ভারত ২০১৭-র যুব (অনূর্ধ্ব ১৭) বিশ্বকাপ আয়োজনের দায়িত্ব পেতে পারে। আর ব্লাটারও আজ বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চপদে নেই। দুর্নীতির অভিযানে ফিফার এথিক্স কমিটি তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে সরিয়ে দিয়েছে। তার সঙ্গে সরানো হয়েছে ফরাসি ফুটবলের রাজপুত্র তথা ইউরোপীয়ান ফুটবল ফেডারেশনের (উয়েফা) সভাপতি মিশেল প্লাতিনিকে। গত বছর ফেব্রুয়ারিতে ফিফায় বিশেষ ভোটাভুটির মাধ্যমে অধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন ইতালি ও সুইজারল্যান্ডের যৌথ নাগরিক গিয়ানি ইনফ্যানটিনি। কিন্তু পূর্বতন অধ্যক্ষ ব্লাটারের সময়েই ঠিক হয়ে যায় ২০১৭-র যুব বিশ্বকাপ আয়োজন করবে ঘুমন্ত দৈত্য ভারত।

আসলে ব্লাটারের ভাবনায় ছিল তিন দশক আগে জাপানে অনূর্ধ্ব ২০ জুনিয়র বিশ্বকাপ আয়োজন করার জন্যই সেই দেশ এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ শক্তি হয়ে উঠেছে এবং পরবর্তীকালে একাধিক বিশ্বকাপ খেলেছে। দক্ষিণ কোরিয়াও এই পদ্ধতি অবলম্বন করে সেই ১৯৮৬ সাল থেকে টানা বিশ্বকাপ খেলে আসছে। এমনকী এই দুই দেশ ২০০২ সালে যৌথভাবে সিনিয়র বিশ্বকাপ সাফল্যের সঙ্গে আয়োজন করেছিল আর সেই বিশ্বকাপে দক্ষিণ কোরিয়া সেমিফাইনাল পর্যন্ত উঠে গেছিল। ভারত একসময় এশিয়ার সেরা দেশ ছিল। আন্তর্জাতিক বৃহত্তম মঞ্চেও মোটামুটি সাফল্য ও গরিমার একটা ধারা মেলে ধরতে পেরেছিল। তারপর কী যে হলো স্বজনপোষণ, দুর্নীতি, প্রতিভার আকাল, সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক ব্যর্থতায় আস্তে আস্তে পিছিয়ে গিয়ে একেবারে তলানিতে চলে যায় ভারতীয় ফুটবল। আর সেই অতলস্পর্শী খাদ থেকে টেনে তুলে আবার ভারতীয় ফুটবলকে এশীয় স্তরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা এবং অসম্ভবকে বাস্তবসম্মতভাবে সম্ভব করে বিশ্বকাপে খেলাতে হলে এ দেশে যুব বিশ্বকাপের আসর বসাতে হবে। তাই ফিফার অন্যকর্তাদের আপত্তি সত্ত্বেও তৎকালীন সর্বময় কর্তা ব্লাটার কাস্টিং ভোট প্রয়োগ করে ভারতে বিশ্বকাপ আয়োজনের সবুজ সঙ্কেত দেন। তাকে প্রভাবিত করেছিল পাঁচ বছর আগে ভারত সফরের মধুর অভিজ্ঞতা ও বাইচুঙ ভুটিয়া এবং জো পল আনচেরির পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন। এই প্রতিবেদন যখন দিনের আলো দেখবে ততদিনে ভারতে যুব বিশ্বকাপ মাঝপর্বে গড়িয়ে গিয়েছে। সারা দেশ বিশ্বকাপের আগে থেকেই উত্তেজনায় টইটম্বুর ছিল। মোট ২৪টি দেশ এই বিশ্বকাপে খেলছে। ভারত অবশ্য আয়োজক দেশ বলে সরাসরি খেলার সুযোগ পেয়েছে। বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেবে গত কয়েকমাসে বহু দেশ সফর করেছে ভারতীয় দল। এই বিশ্বকাপ থেকেই ২০২২-এর কাতার সিনিয়র ফিফা বিশ্বকাপের দল তৈরি করে নেবে বিশ্বের উন্নত দেশগুলি। এই সব অনভিজ্ঞ, অনামী ছেলেরাই আগামী দিনে বিশ্বমঞ্চের সুপারস্টার, মেগাস্টার হয়ে উঠবে। ভারত যদি এই বিশ্বকাপ আয়োজন করার যথাযথ সুফল ফলাতে পারে, তাহলেই ব্লাটারের স্বপ্ন ও ভারতবাসীর অপূর্ণ ইচ্ছে পূরণ হতে পারে। অর্থাৎ আগামী দিনে ভারতও সিনিয়র বিশ্বকাপ খেলবে। তবে বিশ্বকাপ আয়োজনের দৌলতে কলকাতা, গোয়া, মুম্বই, দিল্লি, কোচি ও গুয়াহাটিতে যে উন্নত স্টেডিয়াম, ট্রেনিং পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে সেটাও বড় সম্পদ। এই পরিকাঠামো ও পরিষেবা কাজে লাগিয়ে যদি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিজেকে ঠিকমতো মেলে ধরতে পারে তাহলে ভারত আবার স্বমহিমায় উজ্জ্বলবৃত্ত রচনা করবে আন্তর্জাতিক ফুটবলে। দশ বছর আগে ব্লাটার যেসব পরিকল্পনার বাস্তব প্রয়োগের কথা বলে গেছিলেন, সেই মতোই সব রূপরেখা করা হয়েছে ফেডারেশনের তরফে ৬টি শহরে। আশা করা যায় বিশ্বকাপ উপলক্ষে ফিফার উচ্চপদস্থ কর্তা থেকে প্রাক্তন তারকা কোচ মিডিয়া এমনকী লাখো বিদেশি পর্যটকের কাছে উচ্চ প্রশংসিত হবে প্রত্যেকটি শহরের পরিকাঠামো। ■

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. KOL RMS/048/2016-18
16 October - 2017 - Rs. 10.00, Depavali Spl. Issue

डेंगू फैलाने वाला एडीज मच्छर

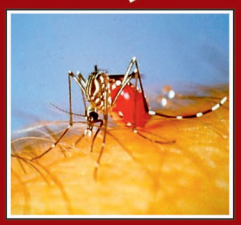

आपके घर में एवं घर के आसपास
जमा साफ पानी में पैदा होता है
और यह दिन के समय काटता है।

एडीज मच्छर को पैदा होने से रोकने के लिए

यह करें :

- छत पर एवं घर के आसपास अनुपयोगी सामग्री, पुराने टायर, टूटे डिब्बे, डिस्पोजल, टूटे मटके, पुराने जूते में जमा हुआ वर्षा का पानी एडीज मच्छर की पैदावार के मुख्य स्थान हैं। इनमें पानी जमा न होने दें। इससे मच्छरों को पनपने से रोका जा सकता है।
- सप्ताह में एक बार अपने कूलर्स का पानी खाली कर दें। फिर सुखाकर ही पानी भरें।
- पानी के बर्तन, टंकियों आदि को ढँक कर रखें। जिससे मच्छर प्रवेश कर अण्डे नहीं दे सकें।
- घर के आसपास के गड्ढों को मिट्टी से भर दें। पानी भरे रहने वाले स्थानों पर मिट्टी का तेल या इंजन का जला हुआ ऑइल डालें।
- सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें, पूरी आस्तीन के कपड़े पहने।
- बुखार के रोगी को मच्छरदानी में आराम करावें।
- हैण्डपम्प के आसपास पानी एकत्र न होने दें।

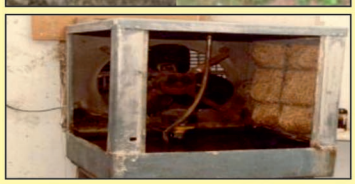

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी **मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जनहित में जारी** आकल्पन : मध्यप्रदेश माध्यम/2017

Published and Printed by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6.
Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. ।। দাম ১০্ টাকা।।